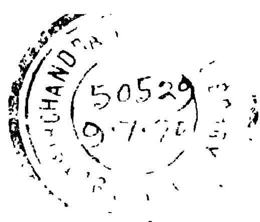
পরমাপ্রকৃতি

সারদামণি

শ্রীমতী গুপ্ত



সাহিত্য রূপা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭

প্রকাশিকা :
গৌরী দেবী
সাহিত্যরূপা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

ফাল্গুন—১৩৬৭

পরিবেশক :
নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীসত্য চক্রবর্তী

দাম : দুই টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক
শঙ্কর প্রেস,
৩৭।১।১, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার সারভূতা শ্রীশ্রীসারদামণি। তিনি জগজ্জননী, সর্বকারণ-সম্ভূতা, সর্ববান্ধবরূপিনী জগন্মাতা। তাঁর পূণ্য মহাজীবনী এই সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যেমন অসম্ভব তেমনি সে দুঃসাহসও আমি করিনা। এতে আমার কৃতিত্ব নেই এতটুকু। আমার পূর্বসূরীদের পথানুসরণ করে তাঁদের নব নব মহান সৃষ্টি থেকে যৎসামান্য মাতৃকথা আহরণ করে সংযোজন করেছি মাত্র। লেখায় ভুল ত্রুটি নিশ্চয় আছে, সে জন্য সহৃদয় পাঠক-বর্গের কাছে, ক্ষমা চেয়ে রাখছি এই বই প্রকাশ করবার জন্য প্রকাশক মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। ইতি—

শ্রীমতী গুপ্ত

শ্রীমতী গুপ্তর অন্যান্য রচনা :

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
ভগিনী নিবেদিতা
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

॥ এক ॥

জয়রামবাটি আর শিহর।

দুটি পাশাপাশি গ্রাম। শিহর গ্রামের হরিপ্রসাদ মজুমদার মশায়ের মেয়ে শ্যামাসুন্দরী। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি। ভারি মিষ্টি চেহারা একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

পাশের গ্রাম জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যে। গ্রামের সেরা ছেলে। বিয়ে হলো শিহরের শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে।

ছোট্ট গরীবের সংসার। এটা আনতে ওটা নেই। তাই বলে কেউই দুঃখিত নয়। সকলের মুখে মুখে হাসিটুকু যেন সর্বদাই লেগে রয়েছে।

অভাব আছে, কিন্তু লক্ষ্মী ছাড়েনি। তাই নির্মল শান্তি বিরাজ করছে এদের নতুন সংসারে।

পাশাপাশি গ্রাম। চেনা জানা সকলেই। যখন খুশী যাওয়া আসা যায় এ গ্রাম থেকে সেই গ্রামে।

শ্যামাসুন্দরীও মাঝে মাঝে মনটা কেমন কেমন করলে বাপের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসেন।

সেদিনও এমনি বাপের বাড়ী এসেছেন শ্যামাসুন্দরী।

ঠিক দুপুরে বেলা। হাতে কাজ কর্ম নেই। চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখছেন তিনি। এটা ওটা সেটা। ছোট বেলাকার কত শত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এখানকার গাছ পালা পুকুর ঘাট আর মাটির সঙ্গে।

দুপুর হলেও চারিদিকে যেন একটা থম থমে ভাব। শ্যামাসুন্দরী তাঁদের পুকুরের ধার দিয়ে আনমনে ঘুরে ফিরে দেখছেন। একটু দূরে কুমোরের পোয়ান আর বেলগাছটা এখনো তেমনি রয়েছে।

মনে পড়ে শিব পূজোর জন্যে এই বেলগাছ থেকে কত পাতা তুলেছেন তিনি। আজও আনমনে বেলগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালেন।

এমন সময় কুমোরের পোয়ানের আড়াল থেকে নূপুরের শব্দ কানে আসতে শ্যামাসুন্দরী চমকে ফিরে চাইলেন সেইদিকে।

একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। পায়ে তার নূপুর বাঁধা। রুম ঝুম, রুম ঝুম শব্দে ছন্দে ছন্দে ছুটে এলো শ্যামাসুন্দরীর কাছে। এসেই তাঁকে জড়িয়ে ধরল। আর তিনিও আবেগভরে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন।

কিন্তু একি হ'ল ?

তারপর শ্যামাসুন্দরীর আর যেন জ্ঞান রইলো না। কিন্তু সে রূপ তো ভোলা যায় না। আগুনের মত যেন জ্বলছে এখনো।

অমন মেয়েটি তবে কাদের ?

সে প্রশ্নের মীমাংসা হলো না। তিনি ভাবতে ভাবতে ফিরে এলেন।

তার দিনকয়েক পরের ঘটনা।

শ্যামাসুন্দরী সন্তান সম্ভবা হয়েছেন। সংবাদটি শুনে রাম মুখুজ্যের

খুশীর সীমা নেই। সেই সঙ্গে শ্যামাসুন্দরী সেদিনকার সেই মেয়েটির কথাও বললেন স্বামীকে।

শুনে চমকে উঠলেন রাম মুখুজ্জো।

—বলো – কি ? আমিও তো সেইদিনই দুপুরে আধো ঘুমন্ত অবস্থায় তেমনি একটা মেয়েকে স্বপ্ন দেখেছি। যেন সে আমারই মেয়ে আদর করে আমার পিঠ বেয়ে বেয়ে উঠছে। তাহলে তো........

—তাহলে কি ?

—তাহলে সেই আসছে তোমার কোলে

শ্যামাসুন্দরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে।

ভবিষ্যতের জাল বোনেন দুইজনে।

এমনি করে দিন যায়। উভয়েই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেন সেই পরম লগ্নটির। একটা আলো আঁধারীর খেলা চলে যেন দুজনের মনে।

অবশেষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হলো।

ইংরাজী ১৮৫৩ সালের বাইশে ডিসেম্বর। ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ। জয়রামবাটির আকাশে বাতাসে বেজে উঠলো সেই আগমনী সুর পুন্য লগ্নে শ্যামাসুন্দরীর কোল আলো করে জন্ম নিলো একটি মেয়ে।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন শ্যামাসুন্দরী সেদিনকার সেই জড়িয়ে ধরা মেয়েটিই কি তবে তার কোলে এলো ?

তাকিয়ে দেখলেন রাম মুখুজ্জো সেই দুপুরের স্বপ্নে দেখা পিঠ বেয়ে-ওঠা মেয়েটিই বটে

শুভক্ষণে মেয়ের নাম রাখলেন 'সারদা'।

দিন যায় দিন আসে।

চন্দ্রকলার মত একটু একটু করে বাড়তে থাকেন সারদামণি। ফুলের পাপড়ির মতো কচি কচি হাতখানা দিয়ে মায়ের কাজে সাহায্য করেন। কাজের চেয়ে অকাজই হয়তো বেশী হয়। তবুও মায়ের চোখের মণি সারদামণি।

সর্বদাই মায়ের কাছে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ান।

শ্যামাসুন্দরীর চোখে ভেসে ওঠে পুকুর ঘাটের বেলতলায় সেই ছোট্ট নূপুর পরা মেয়ের মুর্ত্তি।

রাম মুখুজ্যে ভাবেন সপ্নে দেখা সেই পিঠ বেয়ে ওঠা মেয়েটির কথা!

আরো কিছুদিন পর সারদামণি আরো একটু বড়ো হলেন। খেলার সাথী জুটলো সমবয়সী মেয়েরা। তারা পুতুল খেলে, মাটি দিয়ে ঘর বানিয়ে সংসার পাতে। রান্না-বাড়ী খেলে, কিন্তু সারদামণির সে সব যেন ভালো লাগেনা।

সারদামণির ভালো লাগে কালীপূজো খেলা।

খেলার ছলে মাতৃপূজা।

সবাই ভাবে খেলা। কিন্তু একি খেলা? ঐ ছোট্ট মেয়েটির একি খেয়াল? খেলার ছলে ধ্যানে বসেছেন। ধ্যান করছেন কার তা কেউ জানেনা। তবু তো ধ্যান। সে ধ্যানে নিষ্ঠার অভাব নেই। তন্ময় হয়ে গিয়েছেন ধ্যানে।

পাড়ার রামহৃদয় ঘোষাল যাচ্ছিলেন খেলাবাড়ীর পাশ দিয়ে। হঠাৎ থমকে দাড়ালেন। সারদা আর কালী একাকার লাগছে যেন। তাই তো। রামহৃদয় আবার তাকিয়ে দেখলেন; ভুল হচ্ছে না তো?

না। কোনটা সারদা কোনটা কালা চেনা যায় না।

ভয় পেয়ে ঘোষাল মশাই ছুটে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

রাম মুখুজ্যের ছিল তুলার চাষ।

তুলো দিয়ে সুতো কেটে শ্যামাসুন্দরী পৈতে তৈরী করেন। সেই পৈতে বিক্রি করে কোনো প্রকারে সংসার চলে। সারদামণি মাকে

সাহায্য করেন তুলো পেঁজা থেকে পৈতে বানানো পর্যন্ত সব কাজেই সাধ্যমত।

আর ছিলো গোটাকয়েক গরু। তাদের ঘাস আনতে হয় সারদামনিকে। ঝিলের দল ঘাস। এক বুক জল. কোথাও বা গলা জল। তবুও ঘাস না হলে গরুগুলো খাবে কি। তাই রোজই তিনি যান ঘাস আনতে।

সেই পুকুরে আর একটি মেয়ে কোথা থেকে আসে তা কেউ জানে না। সারদামনিও নয়। তবুও মেয়েটি আসে। সারদাকে রোজই সাহায্য করে তার কাজে। কিন্তু অন্য কারুর সাড়া পেলেই মেয়েটি যেন কোথায় চলে যায়।

সারদামণি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন। নাঃ, কোথাও দেখা যায় না তাকে। ভাবেন, থাক ; আবার ত আসবেই। এমনি করে দিন যায়।

এমন সময়ে দেশে এলো দুর্ভিক্ষ।

চারিদিকে বুভুক্ষের দল। হা অন্ন হা অন্ন রব সকলের মুখে। সেই সময়ে রাম মুখুজ্যে তাঁর সঞ্চিত ভাণ্ডার খুলে দিলেন। ক্ষুধিতকে অন্ন দেবার সাধ্যমত প্রয়াস।

খিচুড়ী রান্না হয়। দলে দলে লোক আসে। এসে কেউ ফিরে যায় না। খিচুড়ী ফুরিয়ে যায়। আবার রান্না হয়। গরম খিচুড়ী খেতে অসুবিধা হয় কারো কারো।

সারদামণি অমনি পাখা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করেন। যেন মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং তাঁর সন্তানদের কত আদর করে খাওয়াচ্ছেন। ওদের গরম খিচুড়ী খেতে কষ্ট হবে। মায়ের হৃদয়ে যেন ব্যাথা লাগে। তাই ছুটে গিয়ে ঘর থেকে পাখা নিয়ে এসেছেন।

দূরে দাঁড়িয়ে শ্যামাসুন্দরী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখেন।

বাড়ীর গ্রামে পালা গানের আসর বসেছে। আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোক এসেছে বিস্তর।

শ্যামাসুন্দরীও এসেছেন মেয়েকে নিয়ে।

একদিকে ছেলেরা, অন্যদিকে বসেছে মেয়েরা।

কামার পুকুর থেকে গদাধরও এসেছে তার ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে পালা গান শুনতে। তারাও বসেছে ছেলেদের দলে।

মেয়েদের দলের একজন সারদামণিকে আদর করে বললেন,—বিয়ে করবি ?

—হ্যাঁ।

নির্বিকার উত্তর। ভাবনা নেই চিন্তা নেই। সবারই তো বিয়ে হয়, তারও হবে এতে আর বিচিত্র কি। সরলমনে সোজা উত্তর। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হয়। তাই উত্তর দিলেন সারদা।

—কাকে করবি ? আবার প্রশ্ন করেন সেই মহিলা। কৌতুকের সুর তার কণ্ঠে। টুকটুকে কচি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে যেন ভালো লাগে।

সারদামণি কচি আঙ্গুল তুলে ছেলেদের দলের মধ্যে বসে থাকা গদাধরকে দেখিয়ে দিলেন।

—ওই যে, ওকে।

তেমনি সহজ উত্তর। কাউকে ত বিয়ে করতেই হবে। তাই একজনকে দেখিয়ে দেওয়া। এতে আবার ভাবনা-চিন্তার কি থাকতে পারে।

অবাক হলেন প্রশ্ন কর্ত্রী।

তারপর গান শুরু হলো। সকলের মন গেল সেই দিকে।

গদাধরের নামে নানা কথা বলে নানাজনে।

কেউ বলে ও দক্ষিণেশ্বরে থাকে। কেউ বলে ওর মাথা খারাপ, কেউ বলে, ওর কাঁধে কিছু ভর করেছে। নইলে অমনধারা হয় কখনো? জ্ঞান-গম্যি যদি একেবারে থেকে থাকে।

পাড়ার বিজ্ঞ পড়শীরা চোখ বন্ধ করে রায় দিলেন, ছোঁড়াটার বিয়ে দাও, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গদাধরের মা চন্দ্রমনি আকাশ পাতাল ভাবতে বসলেন।

গদাধরের চাল চলন যেন কেমন কেমন! সংসারে মন নেই। সর্বদা একটা যেন উড়ু উড়ু ভাব।

এই অবস্থায় বিয়ে দিয়ে শুধরে গেছে অনেকে।

চন্দ্রমনি মনে মনে ঠিক করলেন—বিয়ে দিয়েই ওকে বাঁধতে হবে। অতএব আর দেরি নয়। মেয়ের খোঁজ করতে হবে।

শুরু হলো মেয়ে দেখা। কিন্তু পছন্দ আর হয় না। একটা না একটা খুঁত থেকেই যায় তবু পাত্রী দেখার শেষ নেই।

গদাধর সব খবর রাখে। শোনে আর হাঁসে।

—তোমাদের পাত্রী পছন্দ হবে না, বলল গদাধর।

অবাক হয়ে মা চন্দ্রমণি তাকান ছেলের মুখের দিকে। বুঝতে পারেন না কি বলতে চায় সে।

—কেন? প্রশ্ন করেন মা।

—আমার পাত্রী ঠিক হয়ে আছে।

—কোথায়?

—কেন জয়রাম মুখুজ্যের মেয়ে তো কুটোবাঁধা হয়ে আছে।

অবাকের উপর অবাক হন চন্দ্রমণি। জয়রাম মুখুজ্যের বাড়ী পাত্রী কুটো বাঁধা হয়ে আছে!

চাষীরা যেমন ক্ষেতের প্রথম ফসলটির গায়ে কুটো বেঁধে রাখে। হাজার টাকা দিলেও সেটা বিক্রী করবে না। সেটা দিয়ে সে দেবতার যোগ দেবে।

॥ দুই ॥

কথায় বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ।

যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে তার ঘর তাকে করতেই হবে।

তাহলে কি চার বছর আগেকার পালাগানের আসরে সেই যে কচি মেয়েটা আঙুল দিয়ে গদাধরকে দেখিয়েছিল সেই কি গদাধরের জন্য কুটো বাঁধা হয়ে আছে ?

কালে কালে সেই মেয়েটি এলো চন্দ্রমণির ঘরে। চন্দ্রমণির পুত্রবধূ হয়ে এলো সারদামণি।

গদাধরের পরিণীতা বধূ।

নববধূ ঘরে এলে শাশুড়ীকে সোনা দিয়ে মুখ দেখতে হয়। তাছাড়া কচি বৌ। বিয়ের রাতেও দু-একখানা গয়না গায়ে না থাকলে দেখতেও তো কেমন লাগে।

গ্রামের জমিদার লাহা বাবুদের বাড়ী থেকে চন্দ্রমণি খানকয়েক গয়না চেয়ে আনলেন। পরে ফিরিয়ে দেবেন।

কিন্তু গহনা পরবার পর চন্দ্রমনি মহাসমস্যায় পড়লেন। নোতুন বৌ এর গা থেকে গয়না খুলবেন কোন প্রাণে ? হাজার হোক মাতৃজাতি। তারপর ঐ একটি মাত্র ছেলের বৌ।

গদাধর চিন্তা করে উপায় বের করে। বলে,—ও ঘুমোলে আমি খুলে দেব'খন।

সারদামণি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সেই সুযোগে গদাধর গয়না খুলে মাকে দিয়ে দিয়েছে।

ঘুম ভাঙতে অবাক হয়ে চেয়ে দেখল সারদামণি তার গায়ে একখানিও গয়না নেই।

—ওমা, আমার গয়না কি হলো?

ছুটে এলেন চন্দ্রমণি। সারদার চোখ মুছিয়ে দিলেন আঁচল দিয়ে। কোলে তুলে নিলেন তাকে, তারপর বললেন—যাকগে মা, ওগুলো পচা সোনার গয়না, ভালই হয়েছে। আমি গদাইকে বলে তোমাকে ভাল গয়না গড়িয়ে দেব।

অমনি চোখের জল শুকিয়ে গেল।

মুচকী হেসে সারদা বললেন—আচ্ছা।

হাসি আনন্দে দিন কাটে। অভাবের সংসার, কিন্তু সুখের। সারদামণি মাঝে মাছে বাপের বাড়ীর আসেন। আবার ইচ্ছামত চলে যান শ্বশুরবাড়ী।

বছর দুই পরের কথা।

গদাধর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। ভাগ্নে হৃদয় বললে আমি যাব সঙ্গে।

মামা ভাগ্নের মনের মিল খুব। ভাগ্নে আবার মামার চেয়ে চড়া মেজাজের। মুখের লাগাম নেই। কখন কাকে কি বলে বসে তার ঠিক নেই।

গদাধর রাজী হলেন। মামা ভাগ্নে হাঁটা পথেই এসে হাজির হলেন।

পাকা গিন্নীর মত সারদামণি এসে স্বামীর পা ধুইয়ে দিলেন। পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

হৃদয়-এর কি খেয়াল হ'লো কে জানে।

হঠাৎ বলে বসল, মামীর পা পুজো করবো।

সারদামণি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। অতশত বোঝেন না! বোঝার বয়সও হয়নি। তাহলেও সংস্কারে বাধে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। হৃদয় মামীর পা পুজো করে ছাড়লে।

ফিরবার সময়ে সারদামণিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন গদাধর।

দুচার দিনের পর মনে পড়লো দক্ষিণেশ্বরের কথা। আর দেরী করা চলে না। এবার না গেলেই নয়। সারদামণি রইলেন কামারপুকুরে, গদাই দক্ষিণেশ্বরে চললেন।

তারও দিন কয়েক পর সারদামণি চলে এলেন জয়রামবাটী।

দিন কাটতে থাকে। বয়সও বাড়ে। জগতের সব কিছুতেই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তনই দিন দুনিয়ার আদি ও অকৃত্রিম নিয়ম।

ইতিমধ্যে কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

সারদামণি এলেন কামারপুকুরে। ওদিকে গদাই আর ভাগ্নে হৃদয়ও এসেছে দক্ষিণেশ্বর থেকে। সঙ্গে এসেছে একজন ভৈরবী।

তাতে কি হয়েছে। স্বামী যা ভালো বুঝবেন তা তো করবেনই। সারদামণি সেবা করেন নীরবে।

হালদার পুকুরে যেতে বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হয়। অথচ স্নান করতে যেতে হবে সেই হালদার পুকুরে। কিন্তু একা ঘরের বৌ অতদূরে যাবে কি করে। সারদা এখন আর নেহাৎ কচি খুকিটি নয়।

তাই ভাবনায় না পড়েও উপায় নেই।

এমন সময় কারা যেন বাইরে থেকে ডাকলো,—কি গো বৌ যাবে নাকি হালদার পুকুরে স্নান করতে?

দোর খুলে সারদা তো অবাক। সাত-আটটা মেয়ে কলসী কাঁখে বাইরে দাঁড়িয়ে। অথচ ওদের কাউকেই চেনে না সারদা।

—তোমরা কে গা? সারদামণি শুধোয়।

—ওমা, তুমি আমাদের চেন না নাকি? আমরা এই পাড়াতেই থাকিগো, নাও চলো স্নান করে আসি! রোজই এই সময়ে তোমায় নিয়ে যাবো, বুঝলে?

তাই বটে।

রোজই এই সময়ে মেয়েগুলো আসে। সারদা যায় তাদের সঙ্গে স্নান করতে হালদার পুকুরে। অন্য সময়ে তাদের একটিবারও দেখা পাওয়া যায় না।

এদিকে গ্রামে গদাধরের নামে নানারকম গুজব রটেছে। নানা লোকের মুখে নানাকথা কানে আসে। সারদা কোন কথায় কান দেয় না। তবুও স্বামীনিন্দা শুনতে পারে না কোন স্ত্রী।

সারদা ফিরে এসেছে জয়রামবাটিতে।

খবর পেয়ে গ্রামের আত্মীয়-স্বজন পরিচিত পরিজনেরা আসে সান্তনা দিতে। এসবও ভালো লাগেনা সারদার। উঠে গিয়ে ভানু পিসির দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে। এখানে কেউ আসবে না সান্তনা দিতে। তবুও খানিকটা নিরিবিলি।

ভানুপিসির মনে সারদা সম্বন্ধে অন্যভাব। ব্যথিতের ব্যথা বোঝে যে ব্যথী হয়। তাই ভানুপিসি কিছু বলে না। তিনি জাতিতে সদ্‌গোপ। সর্বদাই ব্রজগোপীর ভাব।

সারদার কথা ভেবে আকুল হন মা শ্যামাসুন্দরী। মেয়েটা শেষে সুখী হলো না। কিন্তু ভানুপিসি বলে অন্যকথা।

—তোমার মনটাই অমনি! জামাই এর জন্যে দুঃখ করোনা বউ ঠাকরুণ। ওতে তার অকল্যাণ হবে। জামাই তোমার সাক্ষাৎ

শিব। যাদের চোখ নেই, তারা চিনবে কেমন করে। একদিন বুঝবে আমি খাঁটি কথা বলেছিলাম কিনা।

শ্যামাসুন্দরী বলেন,—তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

সারদামণি মনে মনে ভাবেন একবার দক্ষিণেশ্বর গিয়ে ঘুরে আসতে পারলে যেন শান্তি হতো। কিন্তু নিয়ে যাবে কে। বাবাকে বলতে লজ্জা করে। কি করি, কি করি করে সময় কাটে।

কথাটা কোন প্রকারে রাম মুখার্জী জানতে পারলেন। তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন।

—কথাটা আমাকে কেন বলিসনি মা! সে তো ভালো কথা। তোকে আমি নিয়ে যাবো! অনেকদিন ওদিকে যাইনি। ঘুরেও আসা যাবে আর সেই সঙ্গে গঙ্গাস্নানটাও করে আসব।

অতএব, যাওয়া ঠিক হলো।

চৈত্রমাসের খরা রোদ্দুরের দিকে তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায় যেন। অথচ ষাট মাইল মেঠো রাস্তা হেটে যেতে হবে কলকাতায়।

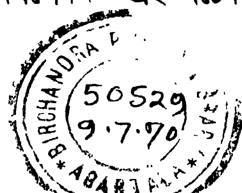
রাস্তা শেষ হতে চায়না। তবুও যেতে হবে।

বাবার সঙ্গে সারদামণি চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে। স্বামীগৃহে, স্বামীকে প্রত্যক্ষ করতে। বুক ভরা আশা, তেজে ভরা মন। প্রতিকূল আবহাওয়া। শুধু ঈশ্বর ভরসা।

দিনের শেষে চটিতে এসে বিশ্রাম করতে হবে।

প্রচণ্ড রোদ্দুরে হাটতে হাটতে ক্লান্তিতে শরীর ঝিমিয়ে পড়ে। ধকল সহ্য করতে পারেন না সারদামণি। ভয়ানক জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

রাম মুখার্জি ও দুচোখে অন্ধকার দেখলেন। এই অচেনা জায়গায়



কে দেবে একফোঁটা জল। কে করবে সেবা। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন।

সারদামণি জ্বরের ঘোরে চোখ খুললেন। দেখলেন কে একজন ঘরে ঢুকলো!

তাকে দেখেই চিনতে পারলেন সারদা। এতো সেই পুরনো বন্ধু। ঘাস কাটার সময়ে রোজই যে ওর সঙ্গে থেকে ওকে সাহায্য করতো।

মেয়েটি পাশে এসে বসে সারদার চোখে জলের ছিটে দিয়ে মুছিয়ে দিল! তারপর আদর করে বললে—একি তুমি কাঁদছ কেন। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কাল সকালে পাল্কী আসবে। আমিও দক্ষিণেশ্বর থেকেই আসছি। সেখানে সকলেই ভাল আছেন। এখন ঘুমাও।

সারদামণি আবার ঘুমোলেন। বড় শান্তির ঘুম। রাম মুখার্জী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

যথাসময়ে সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছুলেন।

ঠাকুর সারদাকে দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন,—আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি এসেছ; ভালই হয়েছে থাকো দিনকয়েক এখানে।

সারাদিন নবত ঘরে থাকেন সারদামণি। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে শয়ন করেন। মনে এতটুকু প্রতিক্রিয়া নেই। সহজ সরল কথাবার্তা আচার ব্যবহার।

নানারকমভাবে ঠাকুর সারদাকে পরীক্ষা করেন!

ক্রমাগত সাত মাস একই শয্যায় শয়ন করেও সারদার মনে এতটুকু কামভাবের উদয় হয় না। ঠাকুর মহাখুশী।

ঠাকুর প্রশ্ন করেন সারদাকে,—তুমি কি আমাকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে এসেছ ?

সারদা বললেন,—তা কেন। তোমার যেমন খুশী। তুমি সিদ্ধিলাভ করতে চাও, আমিও চাই তুমি সিদ্ধিলাভ করো।

তবে আর কি।

ঠাকুর ষোড়শী পূজা করবেন। হঠাৎ মনে পড়লো নিজের ঘরেই তো ষোড়শী রয়েছে। অতএব তার জন্য দেরী নয় : পুজো করবেন।

পূজোয় বসে সারদা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে তাকাতে ঠাকুর তাঁর সাধনার ফল তাঁর পায়ে অর্পণ করে প্রণাম করলেন।

আবেশভরে সারদামণি বাইরে এলেন।

বাইরে এসে মনে পড়লো,—ছিঃ ছিঃ ঠাকুরের প্রণাম তো ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তাই সেইখানে দাঁড়িয়েই প্রণাম করলেন ঠাকুরকে।

॥ তিন ॥

আর একবারের কথা।

জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর চলেছেন সারদামণি। দলবেঁধে জন কয়েক লোক চলেছে ঐ দিকে! তাদের সঙ্গ নিয়েছেন সারদামণি।

কামার পুকুরের পরেই বিরাট তেপান্তরের মাঠ।

লোকে বলে ডাকাতের মাঠ। খালি ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। এ পথ দিয়ে পারতপক্ষে বড়ো একটা কেউ চলা ফেরা করে না। সুযোগ পেলেই ধনে প্রাণে মেরে ফেলে ঠ্যাঙাড়েগুলো।

প্রায় বিকেল নাগাদ ওরা আরামবাগ পৌঁছলেন। খানিকটা বেলা তখনো রয়েছে। অথচ এই বেলাটুকুর মধ্যে ডাকাতের মাঠ পার হতেই হবে। নইলে বিপদ অবধারিত।

দলের সরদার একটু বিশ্রাম করেই যাত্রার আদেশ দিলেন।

কিন্তু সারদামণি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে আর যেন হাটতে পারছেন না। শরীর আর বইছে না। সন্ধ্যের আগেই মাঠ পার হতে হবে।

সারদা বললেন,—তোমরা এগিয়ে চলো আমি ঠিক আসব।

সকলে যে যার তালে এগিয়ে চলে। দিনের আলো নিভে আসে একটু একটু করে। তবুও মাঠ যেন শেষ হয় না। চারিদিকে শুধু খা খা করছে মাঠ।

সারদামণি ইতিমধ্যে দলছাড়া হয়ে পড়েছেন। বেশ খানিকটা পিছনে।

তবুও সাধ্যানুযায়ী চলেছেন এগিয়ে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। সারদামণি আন্দাজে চলেছেন। কোনদিকে যাচ্ছেন, কোনদিকে পথ কিছুই জানা নেই।

হঠাৎ কারা যেন সামনে এসে দাঁড়ালো।

তাদের দেখে চমকে উঠলেন সারদামণি। বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা! হাতে লাঠি। ঝাঁকড়া চুল মাথায়। বজ্রগম্ভীর স্বর।

—কে বটে? কোথায় যাবি?

এতটুকু ভয় পায়নি সারদামণি। বুকে সাহস করে বললেন,

—আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি বাবা। যাবো দক্ষিণেশ্বরে। যাদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম, তাদের হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দাও বাবা।

বাবা ডাক শুনে ডাকাত গিন্নি সামনে এসে দাঁড়ায়।

সারদা তার হাত ধরে বললেন,—মা আমি তোমার মেয়ে। তোমার জামাই থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছিলাম; পথ হারিয়ে ফেলেছি। বাবাকে বলো আমাকে পৌঁছে দিতে।

মা ডাক শুনে ডাকাত গিন্নির মন গলে গেল। ভারী খুশী হলো।

এ মেয়ে কি সাধারণ মেয়ে?

এমন মেয়ের মুখে মা ডাক শুনলে কার মন ভিজবে না?

—এসো মা, আমার সঙ্গে। বলল ডাকাত গিন্নি—আমরা থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই। জামাইয়ের কাছে পৌঁছে দেবার ভার নিলাম আমি।

অগত্যা ডাকাত বাবা লাঠি হাতে মেয়েকে নিয়ে চললেন জামাইএর কাছে দক্ষিণেশ্বরে। রাত্রে চটিতে মেয়ে সারদা নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আর ডাকাত বাবা লাঠি হাতে দরজায় পাহারা দেয়।

সেই থেকে ডাকাত মা বাবা প্রায়ই আসতো দক্ষিণেশ্বরে মেয়ে জামাইয়ের কাছে।

সারদা বলতেন,—তোমরা আমাকে এতো ভালোবাসো কেন? আমি ত আর তোমাদের আপন মেয়ে নই।

ডাকাত বলতো—তুমি যে আপনের চেয়েও আপন আমার। তুমি মানুষ নও মা। তোমারই মধ্যে আমি আমার আরাধ্যা দেবী মা কালীকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমার ডাকাত জীবন সার্থক হয়ে গেছে তোর মত মেয়ে পেয়ে। কত জন্ম পুণ্য করেছিলাম যে, এই জন্মে এমন মেয়ে পেলাম।

সারদামণি শুনে হাসতেন আর বলতেন—সব পাগল।

সারদামণি আর লক্ষ্মী।

নহবত ঘরের ছোট্ট কুঠুরিতে দুজনে থাকেন।

ঠাকুরের কিন্তু সকলের সব কাজের দিকে নজর থাকে। সব কিছুর খোঁজ খবর রাখেন। শুধু খবর রাখা বল্লে সব বলা হয় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

সারদামণি আর লক্ষ্মীকে তাই তিনি বলেন শুকসারী।

ওঁরা কখন কি করেন তা ঠাকুরের অজানা নয় কিছুই।

ভাইপো রামলালকে ডেকে বলেন,—রামনেলো শুকসারীকে দুটি ছোলা দিয়ে আয়।

বাইরের কেউ শুনলে অবাক হতো না। ভাবতো ঠাকুর বোধ হয় পাখী টাখী কিছু পুষেছেন। তাই আর কেউ শুকসারীর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতো না।

কিছুদিন থেকে ঠাকুরের ভাবনা হয়েছে, তিনি না থাকলে

সারদামণির চলবে কেমন করে। কথাটা সারদামণিকে জিজ্ঞেস করবেন বলে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

সেদিন আর না বলে পারলেন না।

—বলি হ্যাঁগো! তোমার মাসে কত হাত খরচ লাগে?

এমন প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় একটু অবাক হওয়া স্বাভাবিক। তবুও অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে উত্তর দিলেন,—পাঁচ টাকার বেশি নয়।

—রাতের বেলা রুটি খাও ক'খানা? আবার বললেন ঠাকুর!

সারদামণি তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—খানপাঁচেক। কথাটা বলতে গিয়ে তিনি একটু লজ্জাও পেলেন।

ঠাকুর হেসে বললেন,—তাহলে আর ভাবছি কেন পাঁচ-ছ'টাকায় তোমার দিব্যি চলে যাবে।

ঠাকুরের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন সারদামণি। তাঁর কথাই বেদবাক্য। মুখের কথা পড়তে যতটুকু সময় লাকে পালন করতে তত সময় লাগে না যেন।

কিন্তু যত গোল বাধে তাঁর মাতৃত্বের বেলায়।

তাঁর মাতৃত্বের অধিকারে কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করতে পারতেন না সারদামণি।

যত বড়ো পাষণ্ড আর পাপীই হোক না কেন, একবার মা বলে ডেকে মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারলেই হলো।

ঠাকুর সব লক্ষ্য করেন। শুকসারী কখন কি কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

একদিন সারদামণি লক্ষ্য করলেন ঠাকুরের মুখটা গম্ভীর।

সারদামণি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঠাকুর বললেন—ওই মেয়েটি আসে কেন?

—কোন মেয়েটি? শুধোলেন সারদামণি।

—ঐ যে গো—সেই মেয়েটি।

সারদামণি বুঝলেন ঠাকুর কার কথা বলছেন। তিনি চুপ করে রইলেন—মেয়েটি যৌবনে ভ্রষ্টা ছিল।

সারদামণি বুঝতে পারলেন ঠাকুর পছন্দ করেন না ঐ মেয়েটি এখানে আসা যাওয়া করে। কিন্তু সে যে মায়ের চরণে আশ্রয় নিয়েছে। মা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

তিনি বললেন,—ও এখন ভালো হয়ে গিয়েছে।

—তা হোক, তবুও তুমি ওকে আসতে বারণ করে দিও।

সারদামণি এর কোন জবাব দিলেন না। ঠাকুরের এ আদেশ তিনি রাখতে পারেননি। ঠাকুরও আর কিছু বলেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে যেমন অপরাধই করুক না কেন, মায়ের কাছে এলেই তিনি তাকে উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন।

ঠাকুরের ভক্তরা সকলেই মায়ের সন্তান। সকলকেই তিনি আপন পুত্রের মতো দেখবেন এতে আর আশ্চর্য কি!

ভক্তরা ফল মিষ্টি দিয়ে যায়। সারদামণি তা থেকে সামান্য কিছু ঠাকুরের জন্যে রেখে দিয়ে যে যেমন আসতো তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

ঠাকুর এইসব দেখে মাঝে মাঝে বলতেন,—এমনি বেহিসাবী খরচ করলে চলবে কি করে।

সারদামণি কোন জবাব না দিয়ে চলে আসতেন সেখান থেকে।

ঠাকুর অমনি তাঁর ভাইপোকে ডেকে বললেন,—ওরে রামনেলো! তোর কাকীমাকে এবার শান্ত কর। ও রাগলে আর রক্ষে নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ পারবে না রুখতে।

এমনি খুঁটিনাটি ঘটনা কতই না ঘটে প্রাত্যহিক জীবনে।

সেদিনও ঘটলো তেমনি একটি ঘটনা।

সারদামণি ঠাকুরের খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন মহিলা এসে বললেন, দিন মা আমার কাছে।

সারদামণি অমনি তার হাতেই তুলে দিলেন ঠাকুরের খাবার।

ঠাকুর ডেকে বললেন,—এসব করছ কি তুমি?

—তা আমি কি করবো। বললেন মা,—কেউ মা বলে ডাকলে আমি ফেরাতে পারিনা। তার আব্দার রাখতেই হবে আমাকে।

হঠাৎ একদিন ঠাকুর বললেন,—যখন দেখবে আমি আমার খাবার নিজে না খেয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছি আর কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি তখন বুঝবে আমার দেহ রক্ষার সময় হয়েছে।

কথাটা দিনরাত শ্রীমার বুকে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধতে লাগল।

ঠাকুর বিনা জগৎ সংসার যে অন্ধকার তাঁর কাছে।

শ্রীমা চমকে উঠলেন।

তবে কি ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন আগতপ্রায়? সারদামণি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন যাবত ঠাকুরের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

গলায় কী যেন হয়েছে। কিছু গিলতে পারেন না। কষ্ট হয়।

ভক্তরা চিকিৎসার জন্যে ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে গেল। সারদামণি রইলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু একা একা থাকতে খুব কষ্ট হয়। ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে পড়লেন শ্রীমা।

ধীরে ধীরে শরীর ভেঙ্গে পড়লো।

অতঃপর মায়ের ইচ্ছায় ভক্তরা মাকে নিয়ে গেল কলকাতায়। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের পঞ্চান্ন নম্বর বাড়ীতে। ঠাকুরের কাছে এসে শ্রীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন যেন।

দিনকয়েক পরে ঠাকুরকে চিকিৎসকের পরামর্শ মত কাশীপুর নিয়ে আসা হলো। একদিন ঠাকুরের ইচ্ছা হলো ভিক্ষার অন্ন গ্রহণ করবেন।

শ্রীমা একটি টাকা দিয়ে ইচ্ছা পূরণ করলেন।

পানিহাটিতে বিরাট মেলা বসেছে।

ভক্তরা ঠাকুরকে বলল তারা শ্রীমাকে মেলায় নিয়ে যাবে।

—বেশতো, ইচ্ছে হয়তো যাও না। বললেন ঠাকুর।

শ্রীমা ওদের কথা শুনে বললেন—তোমরা যাও বাবা, ওতেই আমার যাওয়া হবে। আমি গেলে ঠাকুর যে একা থাকবেন।

কথাটা শুনে মনে মনে হাসলেন ঠাকুর। বললেন ও খুব বুদ্ধিমতী।

একজন মাড়োয়ারী দশহাজার টাকা নিয়ে এলো ঠাকুরকে দিতে তার ইচ্ছে হয়েছে।

ঠাকুর সব শুনে মাকে দেখিয়ে দিলেন।

সারদামণি বললেন—আমার কাছে ও সব টাকা পাঠাও কেন। আমি নিলেও ত তোমার নেয়া হলো।

শ্রীমা নিজের স্বরূপটি লুকিয়ে রাখতেন।

এমন কি যে যোগীন মা সারাদিন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থাকতো সেও জানতে পারেনি।

কিন্তু চিরকাল কি লুকিয়ে রাখা যায়?

একদিনের কথা। শ্রীমা ধ্যানে বসেছেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে যোগীন মা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তবুও কোন সাড়া নেই।

পূজো করতে করতে পূর্ণ সমাধি হয়েছে।

যোগীন মা নিঃশব্দে চলে যায়।

কথাটা শুনে ঠাকুর বললেন,—ওযে সরস্বতী। পৃথিবীতে জ্ঞান বিতরণ করতে এসেছে। পূর্ণ জ্ঞানদায়িনী তোমাদের মা।

যোগীন মা হাসতে হাসতে একদিন না বলে পারলো না।

তোমার নাকি ভাব টাব হয়না?

শ্রীমা হেসে ফেললেন। বললেন,—তোমরা কি দেখতে কি দেখেছ তা আমি কেমন করে বলবো।

বিয়ের সময়কার সেই গয়না খুলে নেবার কথা ঠাকুর কখনও ভোলেননি।

একদিন হঠাৎ হৃদয়কে ডেকে বললেন,—ওরে হৃদে সিন্ধুকটা খুলে দেখতো কত টাকা জমেছে। আমার আবার মনে থাকেনা। তোর মামীকে দুজোড়া গয়না বানিয়ে দিতে হবে। আমি যে কথা দিয়েছি।

হৃদে তাই করল।

তাছাড়া মাঝে মধ্যে ঠাকুর রঙ্গ-রহস্যও করতেন।

সেদিন নবহত ঘরে শ্রীমা পূজোয় ব্যস্ত। এমন সময় একজন মহিলা এসে দাঁড়ায় সামনে। মুখটি বিষাদে ভরা। যেন বিপদে পড়ে এসেছে এমনি ভাব। যেন মায়ের কাছে অতিবড়ো বিপদে পড়ে শরণ নিতে এসেছে।

শ্রীমা মুখ তুলে তাকালেন স্নেহমাখা সুরে বললেন,—কি চাই মা?

মহিলাটি বলল—ঠাকুর আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমার স্বামীর চরিত্র ভালো নয়। তার জন্যে একটা কিছু ওষুধ দিতেই হবে আপনাকে।

কথা শুনে শ্রীমা মনে মনে খুব হাসলেন। বাইরে হাসি চেপে বললেন,

—সে কি, ও সব ওষুধ তো তিনি নিজেই দেন। তুমি বরং তাঁরই কাছে গিয়ে চেপে ধরগে।

মহিলাটি তাই করলো। ঠাকুরের কাছে ফিরে গেল।

ঠাকুরও সেই কথাটি ঘুরিয়ে বললেন, দেয়নি বুঝি? তুমি ভালো

করে ধরতে পারনি। এক কথায় কি আর কেউ ওষুধ দেয়। এবার গিয়ে ধরবে ত আর ছাড়বে না।

এমনি বার কয়েক আসা যাওয়া করতে করতে মহিলাটির মুখের অবস্থা দেখে শ্রীমার মন গলে গেল। তখন একটা বেলপাতা তার হাতে দিয়ে শ্রীমা বললেন,

—এই নাও। এটা নিয়ে যাও। এতেই তোমার স্বামী ভালো হবেন।

দক্ষিণেশ্বরে যে সকল ভক্তরা আসা যাওয়া করত শ্রীমা তাদের সকলকেই সন্তান বলে ভাবতেন!

ঠাকুরের কিন্তু সকলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিশেষ করে তাদের স্বভাব ও সংযমের উপর খুব কড়া নজর ছিল।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে শ্রীমায়ের উপর আদেশ ছিল—লাটু পাঁচখানা, বুড়ো গোপাল আর বলরাম চারখানা আর রাখাল দুখানার বেশি রুটি যেন না খায়।

কিন্তু মা কি সন্তানকে খাবার কম দিতে পারে?

শ্রীমা ঠাকুরের এই নির্দ্দেশ মানতে পারতেন না। যার যে কখানি তাতে কার্পণ্য করেননি কখনো।

তাই ঠাকুর বললেন—তুমি মাতৃস্নেহে অন্ধ।

শ্রীমাও বলেন—দুখানা রুটি বেশি খেলে আমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে না। ওদের জন্য তুমি অতো ভেবোনা। আমার ছেলে-দের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। খাবার বিষয়ে তুমি আর এসো না।

এমনি করে দিন কাটে।

ঠাকুরের দিন ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসতে থাকে।

শ্রীমার চিন্তার অবধি নেই। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী তো সবই প্রত্যক্ষ

হয়ে গেল। বাকী ছিল কলকাতায় গিয়ে রাত কাটানো। তাও হয়ে গেল।

সব লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে থাকে একে একে।

তাই শ্রীমা গেলেন তারকেশ্বরে। হত্যা দিয়ে পড়ে রইলেন ঠাকুরের আরোগ্য কামনায়। তৃতীয় দিনে শুনতে পেলেন—কে যেন পর পর হাঁড়ি সাজিয়ে রেখেছে কিন্তু একটা একটা করে সব কটাই ভেঙ্গে যাচ্ছে।

অগত্যা শ্রীমা ফিরে এলেন।

শ্রীমা বুঝলেন কর্ম শেষ হলে সবাইকে চলে যেতে হবে।

ঠাকুর অন্তর্যামী। সবই জানতে পারেন। তবুও মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

—কি হলো তা তো বললে না।

শ্রীমা মাথা নত করে রইলেন।

শ্রাবণ মাসের শেষ।

ঠাকুর শ্রীমার ডেকে পাঠালেন। সংবাদ পেয়ে শ্রীমা ছুটে এলেন।

ঠাকুর বললেন—দেখ আমার মনে ব্রহ্মভাবের উদয় হচ্ছে। আমি যেন ক্রমশঃ কোনো অজানার দিকে এগিয়ে চলেছি।

শ্রীমা আর কিছু বলতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। সবই বুঝতে পারলেন।

ঠাকুর বললেন—এরা সবাই রইলো, ওদের দেখো।

শ্রীমা জলভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে।

দেখতে দেখতে শ্রাবণ মাসের শেষ দিনটি এসে পড়লো। দিন শেষ হয়ে রাত হয়েছে। মধ্যরাত্রের এক মহামুহূর্তে সকলের সামনে ঠাকুর মহাসমাধিতে মগ্ন হয়ে গেলেন। চিরদিনের জন্য ঠাকুর চোখ বন্ধ করলেন।

ঠাকুর নরদেহে আর এ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তিনি সকলের মনে আকাশে-বাতাসে প্রতিটি অনু-পরমানুতে মিশে রয়েছেন।

শ্রীমা এখন একাকিনী—।

ধীরে ধীরে কাশীপুরের বাড়ী অসহ্য হয়ে উঠলো শ্রীমায়ের কাছে। তাই একদিন তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শ্রীমা তীর্থ ভ্রমণ করতে যাবেন। সঙ্গে যাবেন লাটু মহারাজ, লক্ষ্মী দেবী, মাস্টার মশাই, গোপাল মা আর যোগীন মহারাজ।

প্রথমে দেওঘরে গিয়ে দিনকয়েক রইলেন। তারপর কাশী। কাশী থেকে অযোধ্যা, সেখান থেকে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন যাবার সময় রেলগাড়িতে বসে আছেন অন্যমনস্কভাবে। হঠাৎ মনে হলো ঠাকুর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন—কি গো, তোমার কবচটা ঠিক আছে তো?

সোনার তৈরী ইন্ট কবচ।

শ্রীমা সাবধান হলেন। এরপর চিরকাল শ্রীমা কবচটি সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করে থেকেছেন। ঠাকুরের দান।

তীর্থ ঘুরে ঘুরে শান্তি পান না শ্রীমা। সদা সর্বদা মনের মধ্যে হু হু করে। কোন কিছুতেই মন বসেনা।

এমনি সময় ঠাকুর আবার দেখা দিলেন। বললেন—তোমরা এত কাঁদছ কেন, আমি তো তোমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। সব কিছুতেই আমার বিকাশ। যাও, কাজে মন দাও।

এবার শ্রীমা শান্তি পেলেন। ফিরে এলেন তীর্থ থেকে।

—তিন—

তীর্থ থেকে ফিরে কিছুদিন কলকাতায় কাটালেন শ্রীমা।

তার পর চলে আসেন কামারপুকুরে। সঙ্গে এলেন যোগীন মহারাজ আর গোপাল মা।

এদিকে শ্রীমার হাতে পয়সা কড়ি ফুরিয়ে গিয়েছে। রাণী রাসমনির দৌহিত্র শ্রীত্রৈলক্য বিশ্বাস শ্রীমাকে মাত্র পাঁচটাকা হাত খরচা দিতেন প্রতি মাসে। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর তাও বন্ধ হয়ে গেল। বিষয়টা নিয়ে নরেন কয়েকবার অনুরোধ করেছে কিন্তু কিছুতেই ফল হয়নি। অবশেষে শ্রীমা'ই নরেনকে বারণ করলেন। বললেন,—ঠাকুরই যখন চলে গেলেন, তখন আমিই বা টাকা নিই কেমন করে।

দেশে কিছুদিন থাকবেন বলে মনস্থ করে এসেছেন। অবশ্য প্রতি বারেই দেশে এলে আগে কামারপুকুর হয়ে তবে জয়রামবাটি যেতেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও শ্রীমা বৈধব্য বেশ ধারণ করেননি। এইই ছিল ঠাকুরের নির্দ্দেশ। কিন্তু গ্রামে এ নিয়ে নানারকম কথা উঠতে লাগল। অগত্যা লোকের মুখ বাঁচাতে শ্রীমা বিধবার বেশ পরলেন।

ঠাকুর বলতেন,—যার যেমন বিচার। যার যা খুশী ভাবুক গে, তুমি কোনদিন বিধবার বেশ পরবে না।

কিন্তু সমাজে বাস করতে হলে ত সমাজকে বাদ দিয়ে বাস করা যায় না।

বিধবার বেশ পরতেই শ্রীমা যেন চাক্ষুষ দেখতে পেলেন ঠাকুর

আসছেন, আর নরেন আসছে তাঁর সঙ্গে। ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকে জলের ধারা বয়ে চলেছে যেন। ঠাকুর এসে বলছেন, একি, তুমি হাতের বালা খুলেছ কেন? তোমার এ বেশের দরকার নেই। বিকেলে গৌরমণি আসবে তোমাকে সব বলে দেবে।

সত্যিই বিকেলে গৌরিমা এসে শ্রীমাকে বোঝালেন যে তাঁর বৈধব্য অসম্ভব।

শ্রীমা আবার সধবার বেশ পরলেন।

কথায় বলে বিপদে পড়লে সাহস বাড়ে।

সারদামণি কখনো কারো সঙ্গে তর্ক পর্যন্ত করেননি। একদিন একটা ঘটনায় এটা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন।

হরিশ নামে একটা পাগল ছিল কামারপুকুরে। তার কি খেয়াল হলো একদিন শ্রীমাকে তাড়া করলো। আচমকা তাড়া খেয়ে শ্রীমা প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলেন হরিশও পিছন ছাড়ে না। শ্রীমা যত ছোটেন হরিশও তত ছোটে।

হঠাৎ শ্রীমার মনে হোলো এমনি ভাবে কতক্ষণই বা ছোটা যায়। তাই তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। হরিশ সামনে আসতেই তাকে ধরে ফেলে দিলেন মাটিতে। তারপর তার বুকে হাটু দিয়ে চেপে বসে জিভ টেনে ধরলেন। কায়দায় পড়ে হরিশের পাগলামি ঠাণ্ডা হলো।

সারদামণির অনেকদিনের ইচ্ছা একবার পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে যাবেন! সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। তাই অনেক চেষ্টা করে এবার পুরীতে যাবার ব্যবস্থা করলেন।

ঠাকুর কখনো জগন্নাথ দর্শন করেননি। তাই আগে তিনিই বা কেমন করে দর্শন করেন। অতএব কাপড়ের মধ্যে ঠাকুরের একটি

ফটো নিয়ে গেলেন জগন্নাথের মন্দিরে। প্রথমে ঠাকুরের ছবিকে দর্শন করলেন, তারপর নিজে চোখ তুলে তাকালেন জগন্নাথের দিকে!

শ্রীমা বলতেন ঘট, পট, ছায়া কায়া সবই এক। ঠাকুর দর্শন করেননি, তাই তাঁর ছায়াকে দর্শন করলাম। তাতেই ঠাকুরের দর্শন হয়ে গেল।

কয়েকদিনের মধ্যেই পুরীর সব দেখা হয়ে গেল এবার আবার কাশীর পথে রওনা হলেন।

এসেই আবার গেলেন আঁটপুরে প্রেমানন্দ মহারাজের বাড়ী।

সেখান থেকে ফিরে এসে মনে করলেন তিনি পঞ্চতপা করবেন। কিছুদিন আগে থেকে প্রায়ই এক কিশোর সন্ন্যাসীকে দেখতেন শ্রীমা।

পঞ্চতপা হয়ে যাবার পর শ্রীমা বলেছিলেন,—দশ বারো বছরের এক কিশোর সন্ন্যাসীকে প্রায় সব সময় আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। সে যেন আমাকে কিছু করতে বলছে। মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠতো—তুই পঞ্চতপা কর। অগত্যা একদিন যোগীনকে বললাম সে কথা। যোগীনই আমাকে সব ব্যবস্থা করে দিল।

পাঁচ হাত পর পর চারিদিকে চারিটি কুণ্ড জ্বলবে। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্যের তাপ থাকবে। তার মধ্যে বসে তপ করতে হবে। তারই নাম হলো পঞ্চতপা।

শুভদিন দেখে শ্রীমা পঞ্চতপা সিদ্ধ হলেন। বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

সন্তানের ডাক শুনলে কি মা কখনো চুপ করে থাকতে পারে?

শ্রীমা খেতে বসেছেন।

নাগমশাই এসেছেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ঝি বললো মা এখন খাচ্ছেন, দেখা হবেনা। নাগামশাই তখন সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

ঝি নিচে এসে দেখে নাগ মশাই সিঁড়িতে মাথা ঠুকছেন। সমস্ত মাথা রক্তে রক্তারক্তি। ক্রমাগত মাথা ঠুকেই চলেছেন নাগমশাই।

ঝি দৌড়ে মার কাছে গিয়ে বললো—লোকটা পাগল নাকি। মাথা ঠুকে ঠুকে যে মাথাটা শেষ করে ফেললো। মহারাজ কিছুতেই থামাতে পারছে না।

শ্রীমা ব্যস্তভাবে বললেন,—শীগগির ওকে ডেকে আন। যোগীনকে বল ওকে ডেকে এখানে পাঠিয়ে দিতে।

ঝি গিয়ে নাগমশাইকে ডেকে আনলো।

সামনে এসে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করেন নাগমশাই। মায়ের প্রাণ গলে গেল! তাড়াতাড়ি নাগ মশাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। ক্ষতের মুখে জ্বালাহর প্রলেপ মাখিয়ে দিলেন যেন মায়ের স্নেহ শীতল স্পর্শে।

স্বামীজিও একদিন মা[illegible] প্রণাম করতে এসে অভিমান করে বললেন,—দেখ ত মা ঠাকুরের কেমন বিচার।

মা বললেন,—কি হলো আবার ঠাকুরের সঙ্গে।

স্বামীজি বলেন,—কাশ্মীরে থাকতে এক ফকিরের চেলা রোজই আমার কাছে আসতো বলে ফকির আমাকে অভিশাপ দিলো।

মৃদু হেসে মা বললেন—কি অভিশাপ দিয়েছিলো?

—বলে হেগে হেগে তোকে দিনদিনের মধ্যে কাশ্মীর ছেড়ে পালাতে হবে। আর হলও তাই। ওখানকার নির্জন দিনগুলো বেশ কাটছিল। ঠাকুর কি এই সামান্য অভিশাপ থেকে আমাকে বাঁচাতে পারতেন না? তুমিই বলো।

এবার মা একটু স্নেহের ভাব দেখিয়ে স্বামিজীকে বুঝিয়ে বললেন—এটা তোমার অভিমানের কথা বাবা! মনে করে দেখ, শঙ্করাচার্যও এমনি করে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমাতে আর ঠাকুরে যদি প্রভেদ না থাকে তাহলে রোগ তোমার শরীরে

আসাও যা ঠাকুরের শরীরে আসাও তাই। তাছাড়া ঠাকুর বা তুমি তো গড়তে এসেছো, তোমরা তো ভাঙতে আসোনি। সব বিদ্যাই তো বিদ্যা। সকল বিদ্যাকেই মান্য করবে।

স্বামিজী বললেন,—না মা, তুমি যাই বলো না কেন, আমার মন মানছে না।

—না মেনে তো তোমার উপায়ও নেই বাবা। তোমার যে টিকি বাঁধা। সব কিছুই যে তাঁর ইচ্ছায় চলছে। আমরা তো উপলক্ষ।

এবার স্বামিজী বাধ্য হলেন চুপ করতে। মনে মনে ভেবে দেখলেন মা ঠিকই বলছেন।

নানাকারণে শ্রীমায়ের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংসারধর্ম আর ভালো লাগে না। কোন কাজে মন বসে না। সর্বদা কি যেন একটা চিন্তা মনে জুড়ে থাকে।

এদিকে যোগানন্দ মহারাজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন মার মন আরো খারাপ হয়ে গেলো।

অসুখ যত বাড়তে থাকে মার চোখের জলও বাড়ে। মাঝে মাঝে একটু কম মনে হতে মার মুখ খানিও হাসিতে ভরে ওঠে।

অবশেষে যোগানন্দ মহারাজ দেহ রক্ষা করলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীমা বললেন, আজ এই বাড়ীর একখানা ইট খসে গেল।

এমন সময় ঠাকুর দর্শন দিলেন। সঙ্গে তার বছর দশ বারো বয়সের একটি মেয়ে। মেয়েটিকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন,—তুমি একে নিয়ে থাকো।

ঘুম ভাঙতে মা চিন্তায় পড়লেন। কে মেয়ে, কেমন মেয়ে কবে আসবে। নানা চিন্তা এসে জড়ো হতে থাকে।

দিন কয়েক বাদে সুরবালাকে নিয়ে এসে কাছে রাখলেন।

একে সুরবালার মাথায় ঠিক নেই, তার উপর সন্তান সম্ভবা

তার পরিচর্য্যা করার জন্যে অবলানন্দ মহারাজ একজন স্ত্রী ভক্তকে নিয়ে এলেন শ্রীমায়ের কাছে। সেই দেখাশুনা করে।

কিছুদিন পরে সুরবালার একটি মেয়ে হলো। মেয়ের নাম হলো রাধু।

শ্রীমা রাধুকে কোলে তুলে নিলেন।

সেই সময়ে ঠাকুর আবার দেখা দিলেন! বললেন,—এই মেয়ের কথাই তোমাকে বলেছিলাম। অতএব স্বভাবতই রাধুর উপর মা'র একটু টান বেশিই হবে। তার জন্য ভক্তদের কাছে অনেক অনুযোগ শুনতে হয়েছে শ্রীমাকে।

ভক্তরা বলতেন—তুমি রাধু রাধু করে বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়ছ।

ওদের কথায় জবাবে মা মৃদু হেসে বলতেন,—মেয়েদের স্বভাবই তো এই রকম। নইলে মায়ের জাত বলবে কেন বাবা? একটা মোহ নিয়ে তো থাকতে হবে।

আবার মায়ের জন্যে সন্তানেরও চিন্তার অবধি নেই।

একবার শ্রীমা চলেছেন দেশে। সঙ্গে চলেছেন স্বামী ত্রিগুনাতীতানন্দ মহারাজ।

গাড়ী চলছে; ভিতরে শ্রীমা রয়েছেন।

রাস্তার মধ্যে একজায়গায় বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। রাস্তায় খানিকটা গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে। তার উপর দিয়ে যাবার সময় ঝাঁকুনি লেগে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। ত্রিগুণাতীত মহারাজ ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে মহারাজ ঠিক করলেন সেই ভাঙ্গা জায়গায় নিজে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু ঠিক সময়ে শ্রীমার ঘুম গেল ভেঙ্গে। মহারাজের কাণ্ড দেখে মা তো অবাক।

ত্রিগুণা মহারাজ চুপ করে রইলেন। মা তাকে বেশ খানিক বকুনি দিয়ে গাড়িতে তুলে নিলেন।

সেবার মা গেছেন পুরীতে। পায়ে বড়ো একটা ফোড়া হয়েছে

বেশ কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু ফোড়া কাটতে দেবেন না তিনি। অনেকে অনেক রকম বোঝালো কিন্তু শ্রীমা একেবারে নাছোড়বান্দা। চোখের সামনে নিজের শরীরে ছুরি চালানো সহ্য করতে পারবেন না।

প্রেমানন্দ স্বামী একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

ডাক্তারটিও আবার ভক্ত। কিন্তু অসুখ বলে কথা। দুজনে যুক্তি করে মায়ের কাছে এলেন। ডাক্তার হাতের মধ্যে ছুরি লুকিয়ে রেখে মাকে প্রণাম করার সময়ে শ্রীমার ফোড়া চিরে দিলেন।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন মা।

গল গল করে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে গেল। সেই সুযোগে প্রেমানন্দ স্বামী পালিয়ে গেলেন। আর ডাক্তার মায়ের কাছে মাফ চেয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়লেন।

পুঁজ রক্ত বেরিয়ে গেলে যন্ত্রণা কমে গেল। শ্রীমা বেশ শান্তি পেলেন। তখন সকলকে কাছে ডাকলেন যাদের এতক্ষণ বকে ছিলেন সকলকে আদর করলেন।

শ্রীমা'র ছিল এক মাতাল ভক্ত। মা অন্ত তার তার প্রাণ। যখন যেমন অবস্থায় থাক মা'র নাম মনে পড়লে মাকে দর্শন করতেই হবে। তা সে যেমন করেই হোক। তাকে বাধা দিয়ে বিপত্তি বাধাতে সাহস করতো না কেউ।

বাগবাজারের বাড়ীতে একদিন গভীর রাত্রে এসে হাজির। মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। রীতিমত হৈ হল্লা আরম্ভ করে দিল।

মাতালের সাড়া পেয়ে সবাই চুপ করে রই'লা। কেউ দরজা খোলেনা।

মাতাল যখন সেইখানে বসে মা'র গান গাইতে শুরু করলো। সেই সুরে মা'র ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা উঠে এলেন। সকলকে বললেন —দেখেছ, মাতাল হলে কি হবে তালে ঠিক আছে। জ্ঞান আছে ষোল আনা টনটনে।

গিরিশ এসেছে মাকে নেমন্তন্ন করতে। গিরিশের বাড়ী দুর্গাপূজা। মা রাজী হলেন তবে গিরিশ ছাড়লো।

সপ্তমীর দিনে মা নিজেই গিয়ে পৌছলেন গিরিশের বাড়ীতে! সকলে ছুটে এলো, চারিদিকে মা এসেছেন মা এসেছেন রবে সাড়া পড়ে গেল।

গিরিশ ঘোষ শুনেই ছুটে এলো মাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে এসে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলো।

শ্যামাসুন্দরী দেহত্যাগ করলে মা ভীষণ আঘাত পেলেন।

তিনি বলতেন, আমার মা ছিলেন লক্ষ্মী। সারাবছর ধরে ছেলেদের জন্য এটা ওটা জোগাড় করে গুছিয়ে রাখতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন আমার যোগীন আসবে, সারদা (ত্রিগুণাতীতানন্দ) আসবে। ওরা এসব বড্ড ভালবাসে।

শরৎ আমেরিকা যাবার সময় শ্রীমা'র কাছে অনুমতি চাইতে এসেছেন।

শ্যামাসুন্দরী আশ্চর্য হয়ে সারদামণিকে বলিলেন,—হাঁ মা সারু! এ তোর কেমন কঠিন প্রাণ, মা হয়ে ছেলেটাকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাঠাবি।

শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগের পর সারদামণি হলেন সকলের অভিভাবিকা।

হলে কি হবে। কথায় বলে বিষয় বিষ। মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই ভাইয়েরা সব বিষয় করে বিরোধিতা সুরু করল।

শ্রীমা বুঝতে পেরে সারদাকে ডেকে বললেন, বিষয় ভাগ করে দাও।

সারদানন্দ ভাগ করে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোন ভাগ নেবেন। মা বলে পাঠালেন,—ঠাকুর বলতেন,—ইঁদুরে গর্ত্ত করে বাস

করবার জন্যে আর সেই গর্ত্তে বাস করে সাপ। আমি দু'দিন কালীর ঘরেই থাকবো।

সেবার সুরেন মজুমদার তার ছোট ভাই সৌরীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন শ্রীমার কাছে দীক্ষা দিতে। শ্রীমা তখন অসুস্থ। বলে পাঠালেন—এখন আমি অসুস্থ, পরে এসো।

সুরেনবাবু কিছুতেই ছাড়েন না। মার কাছ থেকে ফিরে যাবো না।

মা তখন বললেন শরতের কাছে যাও।

সুরেনবাবু সেই এক জিদ। বললেন,—আমি মা ছাড়া আর কাউকে জানি না। আপনিই দীক্ষা দেবেন।

শ্রীমা হেসে বললেন,— বলে কি সুরেন, শরৎ আমার মাথার মণি। যা বলবে, যা কইবে শরৎ, তাই হবে। আমি বলছি তুমি শরতের কাছে যাও।

কথাটা শরৎ মহারাজের কাণে যেতে তিনি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,—আসুন আমিই আপনার দীক্ষা দেব

শ্রীমা'র স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীজি।

সেবার সুরেন্দ্রকুমার সেন স্বামীজিকে ধরে বসলেন তাকে দীক্ষা দেবার জন্যে।

স্বামীজি বললেন,—আমি তোর গুরু নই। তোর গুরু আমার চেয়ে অনেক, অনেক বড়ো।

সত্যি সত্যিই হলোও তাই।

কিছুদিন পরে সুরেনবাবু স্বপ্ন দেখলেন,—এক দেবী নিজে এসে তাকে দীক্ষা দিচ্ছেন! পরদিন সুরেনবাবু স্বামীজিকে সব কথা বললেন।

স্বামীজি বললেন,— আমি তো বলেইছিলাম, সময় হলে পাবি। দেবস্বপ্ন মিথ্যে হয় না। তুই স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র জপ কর। তারপর

একদিন সশরীরেই দেখতে পাবি সেই দেবীকে। তিনি বগলার অবতার।

উপরে তিনি মহাশান্ত। পরম শান্তিময়ী। কিন্তু ভিতরে তাঁর সংহারমূর্তি।

সেবার গ্রামের জমিদার লাহাদের পরামর্শে শিবুদাদার স্ত্রী তার মেয়েকে ছোট ঘরে বিয়ে দেবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এ বিয়েতে রামলালের মত ছিল না মোটেই।

খবর পেয়ে সারদানন্দ আর প্রবোধবাবু মেয়েটিকে উদ্ধার করে শ্রীমা'র কাছে এলেন। মা তখন জয়রামবাটিতে।

প্রবোধবাবু বললেন—করলাম বটে, কিন্তু হাজার হোক বড়ো জমিদার, জানতে পারলে কামারপুকুরের মন্দির হবে না।

মা বললেন,—ও কি কথা বলছ। ঠাকুরের মন্দির হবে না কেন?

হয়তো লাহাবাবুরা রাগ না করলেও শিবুদার স্ত্রী রেগে গিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

তাহলে ত খুব ভালো হয়। তিনি ত শ্মশান ভালো বাসেন! পুড়ে গেলে তো শ্মশান হয়ে যাবে। চমৎকার হবে তাহলে।

বলেই মা ভীষণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। সে হাসি আর থামতে চায়না যেন। অমন করে মাকে কেউ হাসতে দেখেনি।

মহাযুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে একবার এমনি ভাবান্তর হয়েছিল! খবর শুনে ভীষণ ব্যথা পেলেন। তবুও ধীরে ধীরে হাসতে লাগলেন। ক্রমশঃ সেই হাসি অট্টহাসিতে পরিণত হল। পুরো দুই মিনিট চললো সেই অট্টহাসি।

ভয় পেয়ে সবাই ছুটে এসে গলবস্ত্র হয়ে বলতে লাগলো—মা রক্ষা কর; রক্ষা কর। তখন মা প্রকৃতিস্থ হলেন।

একবার রাধুকে কথার ছলে মা বলে উঠলেন,—আমি যদি তোকে মারি, তাহলে কোন দেবতা তোকে রক্ষা করবে রে ?

মাঝে কেউ কখনো কিছু দিলে মা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতেন ! পেয়েও খুশী হতেন। খুব যত্ন করে রেখেও দিতেন।

একদিন স্বামী ভবেশানন্দ মাকে একটা তুর্কী মোহর দিলেন। মা সেটাকে যত্ন করে রেখে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন,—মোহরের দাম আর কতই বা। ওর স্মৃতির মূল্যটাই বেশি আমার কাছে।

একবার ভগ্নী নিবেদিতা শ্রীমাকে একটা জার্মান সিলভারের কৌটো দিয়েছিলেন। শ্রীমা সেটাব মধ্যে ঠাকুরের কেশ রেখে দিয়েছিলেন।

প্রায়ই বলতেন, পূজোর সময় কৌটোটাকে দেখলে আমার নিবেদিতাকে মনে পড়ে।

গিরিশচন্দ্র একদিন হঠাৎ মাকে প্রশ্ন করে বসলেন—তুমি কি রকম মা ?

শ্রীমা হাসি মুখে বললেন,—কেন, সত্যিকারের মা। গিরিশচন্দ্র আর কোনো কথা বললেন না।

গিরিশচন্দ্র দেখলেন মা বিছানার চাদর নিয়ে পুকুরে যাচ্ছেন। বুঝতে না পেরে তিনি আর কিছু বললেন না।

রাত্রে শুতে এসে দেখলেন বিছানা পরিষ্কার ধব ধব করছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন এসব শ্রীমার কাণ্ড।

আর একদিন জয়রামবাটিতে মায়ের সঙ্গে খেতে বসেছেন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ। খাওয়ার পর মা বিশ্বেশ্বরের এঁটো বাসন তুলে নিলেন।

বিশ্বেশ্বর চীৎকার করে ওঠে—একি মা, এতে যে আমার অকল্যাণ হবে।

—পাগল ছেলে না হলে অমনি কথা বলে নাকি ? বললেন মা। ছেলেরা যে মায়ের কোল কত ময়লা করে ? আমি আর তোদের কতটুকু করতে পেরেছি।

শ্রীমার কাছে যে সব মহিলারা থাকতেন, তারা মাঝে মাঝে বলতেন,—মা! তুমি ওদের এঁটো ছোঁও কেন?

শ্রীমা সরল হাসি হেসে বলতেন,—আমি যে ওদের মা। মা ছাড়া ওদের আর কে আছে যে করবে?

একবার শ্রীমার পানিবসন্ত হ'লো।

খুব শীগগির আরোগ্যলাভও করলেন। তবুও একেবারে সেরে ওঠেননি। এমন সময় একদিন আশুতোষ মিত্রকে ডেকে বললেন,—আশু আমার ডাঁটা-চচ্চড়ি খেতে ইচ্ছে করছে।

আশু একটা শালপাতার ঠোঙায় করে রান্নাঘর থেকে ডাঁটা চচ্চড়ি এনে দিতে গেল মাকে।

বাধা দিল গোপাল মা।

চীৎকার করে উঠল,—ওকি করছ শূদ্রের হাতে খেলে?

শ্রীমা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন,—থামো. তোমাকে আর বিচার শেখাতে হবে না। আমার ছেলের আবার জাত কিসের?

অভয়ানন্দজী বললেন,—মা, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকো কেন?

মা বললেন,—মা কি কখনো ছেলের সন্ন্যাস নাম ধরে ডাকতে পারে? মায়ের প্রাণে ভীষণ লাগে যে মায়ের ধর্মই যে সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাওয়া।

আমজাদ ছিল মায়ের এমনি আর এক ছেলে।

তার পেশা ছিল ডাকাতি করা। একবার ডাকাতি করে ধরা পড়ে জেল হলো। বাড়ীতে বড়ো কষ্ট সংসার চলে না।

অবশেষে আমজাদের স্ত্রী শ্রীমা'র শরণ নিলো।

কাছে এসে দাঁড়াতেই শ্রীমা তার হাতে একটা টাকা দিলেন। তাছাড়া আমজাদ যখন মার কাজ করে দিতো মা তখন তাকে নিজের কাছে বসে খাওয়াতেন।

মঠে ছিল এক উড়িয়া চাকর। শ্রীমার সামনে এসে কেঁদে ফেল্ল! মা তো অবাক। ভাবলেন, নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অবশেষে চাকরটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, সে চুরি করে ধরা পড়তে স্বামীজি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

অমনি মায়ের প্রাণ গলে যায় করুণায়।

তিনি চাকরটিকে স্নান করিয়ে খাইয়ে বিকেলে স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে করে স্বামীজির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

যাবার সময় বলে দিলেন,—দেখ বাবুরাম, লোকটা বড্ড গরীব। অভাবের জ্বালায় চুরি করেছে তাই বলে নরেন ওকে তাড়িয়ে দেবে কেন? যা, আমার কথা বলবি যে, ওর যেন চাকরী না যায়।

ওদের দুজনকে আসতে দেখে স্বামীজি হাসতে হাসতে বললেন,—দেখ বাবুরামের কাণ্ড। আবার সেই ব্যাটাকে ধরে এনেছে।

বাবুরাম মায়ের আদেশ শুনিয়ে দিতে স্বামীজি আর কিছু বললেন না।

সেবার শ্রীমা মাদ্রাজ, মাদুরা হয়ে রামেশ্বরম গেলেন।

রামনাদ রাজার অধীনে রামেশ্বর মন্দির। তাঁরা জানতে পারলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীমা এসেছেন।

তক্ষুণি কর্মচারীদের উপর রাজাদেশ এলো শ্রীমা'র সামনে যেন রত্নাগার খুলে দেওয়া হয় এবং শ্রীমা যা কিছু ইচ্ছা করেন তা যেন তাঁকে উপহার দেওয়া হয়।

শ্রীমাকে রত্নাগারের সামনে নিয়ে গিয়ে রত্নাগার খুলে দিয়ে কর্মচারী সরে দাঁড়ালেন

বিরাট রত্নাগারে রাশ রাশি হীরে মণি মুক্তোর গয়না ঝকমকিয়ে উঠলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমা।

শ্রীমাকে রাজার আদেশ শুনিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীমা হেসে

বললেন,—আমি এসব দিয়ে কি করবো? আমার কিছুই দরকার নেই, তার চেয়ে রাধু যদি কিছু নিতে চায় তো নিক।

বলে রাধুর দিকে তাকালেন শ্রীমা।

তাকালেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে ভীষণ চিন্তা হলো। কি জানি রাধু যদি সত্যি সত্যিই ঐ সব মনি-মুক্তোর কিছু একটা চেয়ে ফেলে? তাহলে?

শ্রীমা মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করে বললেন—ঠাকুর! রাধুর মনে লোভ দিও না।

ঠাকুর কথা শুনলেন। রাধু চারিদিকে তাকিয়ে বললো,—আমার পেন্সিল ফুরিয়ে গেছে। আমাকে একটা পেন্সিল কিনে দাও।

রাধুর কথা শুনে সকলে অবাক হয়ে গেল। কেমনতরো লোক এরা? এই রাশি রাশি ধনরত্নের কোনই দরকার নেই এদের কাছে?

এমনি একদিন মথুর বাবু ঠাকুরের মাকে বলেছিলেন,—ঠাকুরমা, তুমিত আমার কাছে কোনদিন কিছু চাইলে না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে কিছু চাইতেই হবে। নইলে ছাড়বো না। বলো কি নেবে?

চন্দ্রমণি অবাক হয়ে ভাবতে থাকলেন। কি চাইবেন তিনি। অনেকক্ষণ চিন্তা করে শেষে বললেন, তাহলে আমাকে চার পয়সার দোমাক পাতা কিনে দাও।

যা সত্যি তাকে চেপে রাখা যায় না। যেমন সূর্যের আলোকে ঢেকে রাখতে পারে না মেঘের আবরণ।

শ্রীমা রামেশ্বরে থাকার সময় গেলেন শিবলিঙ্গ দর্শন করতে।

দর্শন হতেই আপন মনে বলে উঠলেন—ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনিই রয়েছে।

সে কথা শুনে ফেলল উপস্থিত ভক্তরা।

তারা বলল,—মা, ও কি বললে?

চমকে উঠে শ্রীমা সেটা চাপা দেবার জন্যে বললেন,—না মা, ও কিছু নয়। এমনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

ভক্তরা আর কিছু বলল না বটে কিন্তু মায়ের স্বরূপ বুঝতে কারো বাকী রইলো না।

তারপর কলকাতায় ফিরে এসে একদিন কেদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—রামেশ্বর কেমন দেখলেন মা?

মা সেই কথা আবার বলে ফেললেন।

গোপাল মা ছিলেন কাছে। তিনি ধরে বললেন,—কি বললে?

—কই, আবার কি বললম? তোমরা অমনি শোন। বললেন শ্রীমা।

গোপাল মা ভক্তিভাবে বললেন,—আর কি লুকোতে পারবে মা? সবই তো শুনলাম। নিজেই ধরা দিয়েছে।

শ্রীমা তখন চুপ করে মিষ্টি মিষ্ট হাসতে লাগলেন.

রাধুর বিয়ে বেশ ঘটা করেই দিলেন শ্রীমা।

রাধুর আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন। বরপক্ষ সেই সুযোগে আরও একটু চাপ দিলো। যদি আরও কিছু আদায় হয়।

ব্যাপার দেখে কেদার দত্ত চটে গেলেন। এটা রীতিমত অন্যায়। না চাইতে যা দেওয়া হয়েছে তা তাদের আশার বাইরে।

শ্রীমা গতিক খারাপ কেদার দত্তকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলেন।

ঘরে কালো রঙের একটা বড়ো বাক্স ছিল। শ্রীমা রাধুকে দিয়ে দিলেন সেটা। মা জানতেন না তার মধ্যে কি আছে; মেয়েকে দিতে হবে। তাতে যাই থাক না কেন মেয়েই তো পাবে।

কিন্তু তা হয়ে কি হল। একজন ঠিক জানতে পারলেন। ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন—হাজার টাকা রয়েছে বাক্সটার মধ্যে। না দেখে শুনে দিয়ে দিলে?

অগত্যা মা লোক পাঠিয়ে বাক্সটি আনিয়ে খুলে দেখলেন সত্যিই এক হাজার টাকা রয়েছে।

শ্রীমা রয়েছেন কাশীতে। সেখানে এক মাড়োয়ারী মহিলা এলেন মায়ের কাছে। অনেকক্ষণ যাবত কি সব বলে গেলেন সেই মহিলা। মা তার এক বর্ণও বুঝলেন না! অবশেষে তার সঙ্গে যে বাঙ্গালী মহিলাটি এসেছিলেন তিনি বললেন—ওর পাঁচটি ছেলে কিন্তু সংসারে শান্তি পান না। মন বসে না কিছুতে। গুরুর সেবা আর ধ্যান করেন তবুও শান্তি নেই। কয়েকদিন আগে স্বপ্নে কি দেখেছেন তাই আপনার কাছে এসেছেন দীক্ষা নিতে।

শ্রীমা কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—ওর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জেগেছে। দীক্ষা নিতে এসেছে ভালো কথা, কিন্তু কাশীতে তো আমি দীক্ষা দিতে পারবো না। কাশী শিবের স্থান। শিবই এখানকার গুরু। কলকাতা বা জয়রামবাটি গেলে আমি দীক্ষা দিতে পারি।

জয়রামবাটিতে ভাইয়ের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল চরমে উঠেছে।

কিছুদিন আগে কোয়ালপাড়া আশ্রমে থাকবার সময়ে আমাশয় হয়েছিল। শরীরটা তখনো অসুস্থ।

ভাইদের বিবাদের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি

ব্যাপারটা ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠলো তাঁর। অবশেষে কেদার বাবুর কাছে খবর পাঠালেন একটা ঘরের ব্যবস্থা করবার জন্য।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালপাড়ায় মায়ের জন্য মাতৃনিবাস তৈরী হলো। বাড়ীর নাম হলো জগদম্বা আশ্রম।

সংবাদ পেয়ে শ্রীমা খুব খুশী হলেন।

কয়েকজন ভক্ত মাকে আনতে গেল। কদিন যাবত ভীষণ বৃষ্টি

হচ্ছে। পারত পক্ষে কেউ ঘরের বাইরে বেরোয় না। সকলে ভাবলো এই বৃষ্টিতে মা আসবেন না। তবুও মায়ের ডাক। তারা না এসে কি পারে? যাওয়া, না যাওয়া, সেতো মায়ের ইচ্ছে।

শ্রীমাকে নেবার জন্যে লোক এসে হাজির দেখে শ্রীমার ভাই খুব চটে গেলেন তাদের উপর।

বললেন,—এই বৃষ্টিতে শেয়াল কুকুর আশ্রয় ছেড়ে বেরোয় না, আর তোমারা ওকে নিয়ে যেতে এসেছ?

ভাইয়ের কথা শুনে শ্রীমা না হেসে থাকতে পারলেন না।

ভক্তরা বললো—আমরা তো মায়ের সেবক মাত্র। তাঁর ইচ্ছানুসারে সব কিছু চলে। আজ যদি তিনি যেতে চান চলুন; না হয় কালই নিয়ে যাবো।

শ্রীমা ভাইকে বললেন,—আমার কথা রাখবার জন্যেই এত কষ্ট করে ছুটে এসেছে ওরা। আর ওদের কথা রাখতে আমি যেতে পারবো না? আমি আজ যাবোই। রাধু বরং এখানে থাক।

সংসারীর মত সংসারে থেকেই জীবন কাটিয়েছেন শ্রীমা। তাই সাধারণ লোকে মাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। এ নিয়ে কেউ কেউ মাকে প্রশ্ন করতে ছাড়েনি। একবার একজন ভক্ত প্রশ্ন করে বসলো,—আপনিও তো মায়ায় আবদ্ধ।

শ্রীমা বললেন,—মা যে নিজেই মায়া মায়ের মায়া না থাকলে তার সন্তানরা বাঁচবে কেমন করে?

ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যেও অনেকে শ্রীমাকে সংসারী মনে করতেন। মনে করতেন শ্রীমা সামান্য মানবী বই আরকি। তাই ঠাকুরও তাদের অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। বলতেন,—যে শালারা মাকে আর ঠাকুরকে আলাদা ভাবে, তাদের কিছু হবে না। আসলে ইটের এপিট ওপিট, বুঝলি?

মা হলুদ ফুল ভালোবাসতেন।

হলুদ ফুল না হলে বগলার পূজো হয় না। তাই মা বুঝি নিজেকে বগলার রূপেই পরিচয় দিয়েছেন।

তিনটি রূপে তিনি বিরাজিত!

কখনো দেবী হয়ে পূজা গ্রহণ করেন আর কখনো মমতাময়ী মাতৃরূপে প্রকাশিত হন। আবার কখনো রুদ্ররূপে ভীষণ মূর্তিতে দর্শন দেন।

জয়রামবাটিতে গগন মহারাজ বসে বসে মুড়ি খাচ্ছেন। শ্রীমাও রয়েছেন সেখানে. এমন সময় এলো এক ভিখারী।

—মাগো দুটি ভিক্ষা পাই। ভিখারিটি ভিক্ষা চাইলো।

শ্রীমা আনমনে বলে ফেললেন,—অনন্ত হাতে দিয়েও শেষ করতে পারছি না বাবা. কথাটা বলেই আবার সামলে নিয়ে গগন মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন—কাণ্ড দেখেছ আমার। আমার হাত তো মাত্র দুটো আর আমি কিনা ওকে শোনাচ্ছি অনন্ত হাতের কথা।

গগন মহারাজ আর কি বলেন। শুধু বললেন, তোমার যেমন ইচ্ছা।

ঠাকুরের দেহ রক্ষার বেশ কিছুদিন পরে একদিন জয়রামবাটি যাচ্ছেন শ্রীমা। সঙ্গে যাচ্ছে শিবলাল। শিবলাল মনে মনে ফন্দি আঁটলো।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে। বাড়ী এখনো বেশ কিছু দূরে। এমন সময় শিবলাল হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শ্রীমা পিছন ফিরে শিবলালকে দাঁড়াতে দেখে বললেন,—ও শিবে, দাঁড়ালি কেন? চল বেলা যে গেল।

শিবলাল বলল—যেতে পারি যদি আমার একটা কথার উত্তর দাও। নইলে তুমি একাই যাও।

মা বললেন—কি আবার কথা, বল।

—তুমি কে ? প্রশ্ন করে শিবলাল।

—কে আবার তোর কাকি।

শিবলাল অভিমানের সুরে বললো,—বেশ যাও তবে তুমি একা। এখন বাড়ীর কাছে এসে পড়েছ, আর কষ্ট হবে না। আমি এই চল্লুম।

শ্রীমা মুশকিলে পড়লেন। তবুও বলেন—ওরে আমি তো তোর কাকি।

শিবলালও নাছোড়বান্দা। বলল—তাহলে তুমি একাই যাও।

শ্রীমা দেখলেন শিবলাল ছাড়বেনা। বললেন,—তা আমি কি করব বল। লোকে বলে আমি মহামায়া।

শিবলাল কাছে এগিয়ে এসে বলে—তবে তুমি কালী ?

—হ্যাঁ। বললেন শ্রীমা।

—তাহলে চলো। যেখানে বলবে আমি রাজী। শিবলালের আনন্দ আর ধরেনা। মায়ের মুখেই শুনেছে 'মা' কে এবার আর তার কোন ভাবনাই রইলো না। চললো সে মাকে নিয়ে বাড়ীর পথে।

আর একদিন উদ্বোধন অফিসের বারান্দায় বসে জপ করছিলেন শ্রীমা। হঠাৎ কি একটা সোরগোলের শব্দ কানে আসতে সচকিত হলেন।

অফিসের অন্যদিকে একটা বস্তি। কুলীমজুরের বাস। শব্দটা সেই দিক দিয়েই আসছে।

একটা মজুর তার স্ত্রীকে ধরে খুব মারছে।

অমনি শ্রীমা গর্জে উঠলেন।

ধমকানি শুনে লোকটা উপরের দিকে চেয়ে শ্রীমা'র রুদ্ররূপ দেখে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। ভয় পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

একজন ভক্ত এসেছে শ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে এনেছে

একজোড়া শাঁখা। রাধু বেজায় খুশী। তাড়াতাড়ি হাতে পরতে গিয়ে দেখে ছোট হয়ে গেছে।

আর যায় কোথা। রাধু অমনি কাঁদতে কাঁদতে বললো,—দেখোনা, দিদিমণি আমার জন্যে শাঁখা এনেছে, কিন্তু পরতে পারছি নে। ছোট হয়ে গেছে।

শ্রীমা তাকে শাঁখা পরিয়ে দিলেন।

তারও কিছুদিন পর।

রাধুর ছেলে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত রীতিমত দুর্ব্বল। বসলো উঠে দাঁড়াতে মাথা ঘোরে। বসে বসে এখানে সেখানে চলাফের করে।

তার উপর আবার আফিংএর নেশা শুরু করছে। মা অনেক চেষ্টা করেছেন আফিংএর মাত্রাটা কমাবার জন্যে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাতে রাধু আরো রেগে যায়।

সেদিন শ্রীমা তরকারী কুটছেন। এমন সময় রাধু এসে বসল মায়ের কাছে। খানিকক্ষণ পরে মা দুঃখ করে বললেন,—আর কতকাল এমনি বসে বসে চলাফেরা করবি? এবার উঠে দাঁড়। তোকে নিয়ে যে আর পেরে উঠছি না। আমার ধর্ম কর্ম যে সব গেল।

ব্যাস। রাধুর অমনি রাগ হয়ে গেল। হাতের কাছে তরকারীর ঝুড়ি থেকে একটা বেগুন তুলে নিয়ে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলো মায়ের পিঠে।

মা বেদনায় চীৎকার করে উঠলেন। দেখতে দেখতে পিঠে সেই জায়গাটা বেশ ফুলেও উঠলো।

তবুও তো মা। তাই মা আর কার উপর রাগ দেখাবেন? সামনে ঠাকুরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠাকুর এর অপরাধ নিওনা। হাজার হলেও ওতো সন্তান।

তারপর নিজের পা থেকে ধুলো নিয়ে রাধুর মাথায় আর কপালে

মাখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—ওরে রাধু, এই শরীরটাকে ঠাকুর কখনো এতটুকু শাসন করেননি, আর তুই কিনা আমাকে এমনি করে কষ্ট দিচ্ছিস। তুই কেমন করে বুঝবি আমি কে? তাহলে তোর ক্ষমতা কি?

অমনি রাধুও মুখঝামটা দিয়ে বললো—স্বামীর তুই কি বুঝিস যে স্বামী স্বামী করছিস?

মা আর কি বলবেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন,—ঠিক বলেছিস মা। আমার স্বামী যে ন্যাংটা সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর মর্ম কজন বোঝে?

রাধুকে তিনি যতই বকুনি ঝকুনি করুন, তবু রাধু অন্ত প্রাণ। রাধুই যেন সংসারের একমাত্র সম্বল।

রাধুর অসুখ হয়েছে। তার জন্য মায়ের যেন আহার নিদ্রা নেই। সর্বদা রাধুর চিন্তা। কেমন করে রাধু ভালো হয়ে উঠবে সেই চিন্তা অহোরাত্র। কথায় কথায় বলেন,—আমি থাকতে যদি ভালো না হয়, তাহলে পরে ওকে দেখবে কে?

দেখতে দেখতে ক'দিন কেটে গেল। অসুখ কমলো না। বাড়ের দিকেই চলেছে ক্রমশঃ।

সুরবালা এসে রাধুর কাছটাতে বসলো।

সুরবালা রাধুর মা। পাগল। তাই বুঝি রাধু তার মাকে দেখতে পারে না। শ্রীমা সব বোঝেন। তাই সুরবালকে সরে যাবার কথা বলতে গিয়ে সুরবালার পায়ে হাত লেগে গেল।

সুরবালা ভীষণ চাৎকার করে ওঠে। বললে—ওমা, আমার কী হবে গো। তুমি একি করলে ঠাকরুণ। আমার পায়ে হাত দিলে।

শ্রীমা তো হেসেই খুন। বললেন,—ওতে কিছু হবে না।

শ্রীমা মনে মনে ভাবেন, এই সেদিন চেলাকাঠ নিয়ে মারতে এসে

এক বিপত্তি ঘটালো; আবার আজ পায়ে হাত লেগেছে বলে কান্না আরম্ভ করেছে।

সেও বেশি দিনের কথা নয়।

রাধু তখনো অসুখে ভুগছে। অত্যাচারও করছে খুশিমত!

শ্রীমা'রও শরীর তখন খুব খারাপ। রাধুর অত্যাচার যেন আর সহ্য হয় না। ক্রমশঃ যেন বিরক্তি ধরে আসছে।

ভক্তরা কিন্তু জানতো মা যখন রাধুর মায়া থেকে মুক্ত হতে পারবেন তখনই দেহ রাখবেন।

সেই সময়ে সুরবালা এসে একেবারে চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলতে লাগলো—তুমিই আমার মেয়ে নাতীকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছ।

শ্রীমা বোধ হয় মায়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন; তাই গম্ভীরভাবে বললেন সুরবালাকে,—নিয়ে যা তোর মেয়ে নাতীকে।

সুরো পাগলীও সেই কথায় গেল ক্ষেপে। অমনি ছুটে গিয়ে চেলা কাঠ নিয়ে এলো মাকে মারবার জন্যে।

পাশে ছিলেন বরদা মহারাজ। তিনি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন পাগলীকে।

উত্তেজনায় শ্রীমা তখন থর থর করে কাঁপছেন। তিনিও চীৎকার করে বলে উঠলেন,—তুই কি করতে বসেছিলি পাগলী। তোর ঐ হাত যে কুষ্ঠ হয়ে খসে পড়বে।

বলেই আবার চমকে উঠলেন তিনি। এ কি করলেন তিনি।

অমনি ঠাকুরকে জানালেন অন্তরে অন্তরে।—এ কি করলাম ঠাকুর। আমার মুখ দিয়ে এ কি কথা বের হলো।

শ্রীমার সে অভিশাপ মিথ্যে হয়নি। পরে সুরবালার হাতে কুষ্ঠ হয়েছিল।

শ্রীমা সকলকে শুধু বৈরাগ্যের উপদেশই দিতেন না। মাঝে মধ্যে বৈষয়িক উপদেশও দিতেন।

কেউ যদি বলত বিয়ে করব না। মা বলতেন, ও মা সেকি কথা পুরুষ আর প্রকৃতি না হলে সৃষ্টি চলবে কেমন করে? দেখছ না দুনিয়ার সব কিছুই জোড় জোড় বাঁধা। তোমার অঙ্গের দিকেই চেয়ে দেখনা, দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, কান।

গৃহীভক্তরা বলল,—ঠাকুর তো আর নেই, এবার কাশীপুরের আশ্রম ভেঙ্গে দাও। কথাটা নরেনের কানে যেতেই নরেন ছুটে এলো।

সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গো এল দল বেঁধে।

নরেন বাধা দিল,—তা হতে পারে না। তাহলে মা কোথায় যাবেন; মাকে আমরা বেঁচে থাকতে নিরাশ্রয় করব কেমন করে? ঠাকুরের শেষ কটা দিন যেখানে কেটেছে মাও থাকবেন সেখানে।

—মা খাবেন কি?

—দরকার হলে ভিক্ষে করে খাওয়াবো! আমরা অর্থাৎ মায়ের সন্তানরা তাহলে আছি কি জন্যে?

মা বললেন, নরেন সত্যিই খাপখোলা তরোয়াল।

গিরিশ ঘোষ এসেছেন জয়রামবাটিতে।

গিরিশের সকল পাপ ঠাকুর নিজের শরীরে ধারণ করেই অসুস্থ হয়েছিলেন।

বহুদিন আগে গিরিশের কলেরা হয়েছিল। সকলেই আশা ছেড়ে দিয়েছিল। শেষ নিশ্বাসটুকুর জন্যে অপেক্ষা করছে গিরিশ। এমনি সময়ে দেখল মাতৃবেশে এক নারী শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

গিরিশের মা মারা গিয়েছিলেন খুব ছোট থাকতে। মায়ের কথা এতটুকু মনে পড়ে না। তবুও মনে মনে মিলিয়ে দেখে! না মনে হয় না। তাহলে এই নারী মূর্ত্তিই তার মা হবেন নিশ্চয়।

কিন্তু ইনি এসেছেন ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যেতে।

নারী মূর্ত্তি এগিয়ে এসে গিরিশের মুখের কাছে কী একটা ধরে বললেন, নাও মহাপ্রসাদ খেয়ে নাও, এতেই তুমি ভালো হয়ে যাবে।

পরম বিশ্বাসে গিরিশ সেই মহাপ্রসাদ খেয়ে নিলো।

তারপরেই ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠলো গিরিশ।

এবার মাকে চাই তার। লোকে বলে কালীঘাট মহাপীঠ। সেখানেই মা আছেন। গিরিশ রোজ গভীর রাত্রে কালীঘাট গিয়ে যেখানে ছাগ বলি হয়, সেই হাড়িকাঠের পাশে বসে মা মা বলে কাঁদে।

হাড়িকাঠের পাশে কেন? তারও কারণ আছে। যেখানে শত শত ছাগ বলি হয়, তাদের করুণ চীৎকারে মা নিশ্চয় কখনো না কখনো তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে আমার দিকে একবার তাকান যদি। যদি তার বিদ্যুৎ চোখের আলোটা ঠিকরে এসে আমার চোখে পড়ে।

ঠাকুর আর নেই। গিরিশের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার মনে হয়। কোন কাজে মন বসে না। বিস্বাদ মনে হয় জীবনটাকে। বার বার মনে হয় ঠাকুর যেখানে গেছেন তাঁর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে মনের কথা খুলে বললেন,—তাঁর কাছে যেতে না পারলে আমার আর শান্তি নেই।

স্বামীজি বললেন—মার কাছে গেলেও তাঁর কাছে যাওয়া হবে।

—তা কি করে হবে?

অনেকের মত গিরিশও শ্রীমাকে শুধু গুরুপত্নী বলেই ভাবতো। তার চেয়ে বেশি আর কিই বা ভাবতে পারে।

কিন্তু নিরঞ্জনানন্দ যে বললো মায়ের কাছে গেলেই সব হবে?

—হ্যাঁ, সবই হবে। মা আর ঠাকুর কি আলাদা? শিব-পার্বতী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ; এরা কি ভিন্ন?

কথাটা ঠিক, বিল্বমঙ্গলে গিরিশ নিজেই লিখেছে এক সাজে পুরুষ

প্রকৃতি। ভগবান মানব রূপে জন্ম নিলেও কি সাধাধারণ নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারেন ?

ঠাকুর তো বলে গিয়েছেন,—অর্দ্ধেক কাজ আমি করে গেলাম, বাকীটা তুমিই করো।

অতএব শ্রীমার কাছেই যাওয়া ঠিক হলো। মা যা বলবেন, তাই হবে।

কয়েকদিন পর মহাতীর্থ জয়রামবাটির পুণ্যকুটিরদ্বা'র জীবনে প্রথম এসে দাঁড়ালো গিরিশ।

প্রথম শ্রীমা'র মুখদর্শন করলে।

চমকে ওঠে গিরিশ। এ কে ? ইনি তো সেই রোগশয্যা পাশের সেই নারীমূর্ত্তি ! ইনিই তো সেই স্বপ্নে দেখা দেবী। তবে ইনিই কি সেই বিমুক্তফলদায়িনী দুর্গে দুর্গতি হরা ? ইনিই কি সেই প্রাণমন্ত্র স্বরূপিনী শ্রী মা সারদা ?

আনমনে বলে ওঠে গিরিশ—মা গো, সেই কি তুমিই ?

শ্রীমা একটু হাসলেন।

না না, হাসলে হবে না মনের শান্তি। মাকে বলতে হবে,—বলো মা তুমি কেমন মা ? তুমি কি শুধু পাতানো মা ? বলো মা, বলো।

শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে মা বললেন,—আমিই তোর সত্যিকারের মা। পাতানো মা'ও নই, আর গুরুস্ত্রী মা'ও নই ; আমিই আসল মা।

গিরিশ চুপ করলো।

ঠাকুরকে একদিন গিরিশ বলেছিল,—লেখা-পড়া, অভিনয়-থিয়েটার সব ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।

শুনে ঠাকুর বললেন,—না না, ছাড়বার দরকার নেই। ওতেও তো লোককল্যাণ হচ্ছে। যেমন করছো যেমনি করে যাও।

তাই আজ গিরিশ মনে মনে ঠিক করেছে মায়ের কাছেও সেইকথা বলবে। কিন্তু বলতে হলো না। অন্তর্যামী মা মনের কথা বুঝতে পেরে

বললেন, ঠাকুর তো তোমাকে সংসার ছাড়তে বলেননি। তবে আর সে চিন্তা কেন? যেমন বই-টই লিখছ তেমনি লিখে যাও। এও তো তাঁরই কাজ।

বেশ। মায়ের যদি তাই ইচ্ছে হয় তো তাই হবে।

মায়ের ছেলে হয়ে সংসারে থাকাটাও তো পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে আর ভয় কিসে। জীবনতরী চালিয়ে যাও স্রোতের মুখে, যিনি রক্ষা করবার তিনিই দেখবেন।

কলকাতায় ফিরে এসে গিরিশ চিঠি লিখলো মাকে,—এবার শারদীয়া পূজায় তোমাকে আসতেই হবে আমার এই দীনালয়ে।

সন্তানের ডাকে সাড়া না দিয়ে মা কখনো থাকতে পারে? শরীর খারাপ। তবুও রাজী হলেন। ঠাকুরের বীরভক্ত। অবিচল বিশ্বস্ত ভক্ত গিরিশ মায়ের কাছে একেবারে শিশুটি যেন।

প্রণাম করার সময় মা বলছেন—গিরিশ যেন একটা পাঁচ বছরের শিশু।

শিশু নয়তো কি? মায়ের কাছে ছেলে কি বুড়ো হয় না বড় হয়?

দক্ষিণা বললো,—বাব্বা, গিরিশের যা জিদ। বলে কি না' মা না এলে পুজোই করব না।

স্বামিজী বলতেন জ্যান্ত দুর্গা।

সপ্তমীর দিন বলরাম বোসের বাড়ীতে মায়ের সামনে কল্পারম্ভ হলো, লোকের ভীড়ে ঠেসাঠেসি। সকলেই মাকে প্রণাম করবে, নিজ হাতে জল দিয়ে ধুয়ে দেবে মায়ের চরণ দুখানি।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, তিনি সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে শুধুমাত্র পা দুখানি খোলা রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

তারপর পূজার লগ্ন এলে চলে এলেন গিরিশের বাড়িতে।

সর্বশরীর তেতে আগুন, ভীষণ জ্বর। তবুও সন্তানের ডাকে সাড়া না দিলে যে মাতৃনামের অমর্য্যাদা হবে।

গিরিশ মন খারাপ করে বৈঠকখানার ঘরে চুপটি করে বসে আছে। মা কি আসবেন না?

বলতে বলতে সাড়া পড়ে গেল মা এসেছেন।

অমনি ছুটে গেল গিরিশ। ছুটে এলো অন্যান্য ভক্তরা। ভক্তি ভরে মায়ের চরণ বন্দনা করলো সকলে।

গিরিশের বাড়ীতে আরো ভীড়। মা এসে উঠলেন দালানে। সেখানে রয়েছে দশভূজার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি।

মৃন্ময়ীর সামনে এসে দাড়ালেল চিন্ময়ী মা।

ভক্তরা দিশেহারা। কার পায়ে অঞ্জলী দেবে?

অঞ্জলীর সামগ্রী পাহাড় প্রমাণ উঁচু হয়ে আছে। তুলসী-বেলপাতা ফুল আর দুর্বা, জবা আর পদ্ম। প্রতিমার পাশে মা ও দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চল নিথর হয়ে।

শেষ পর্যন্ত জ্বর আর বাগ মানল না।

মহাষ্টমীর রাত্রে গিরিশের কাছে খবর গেল—মা'র জ্বর বাড়াবাড়ি মা যেতে পারবেন না।

উদভ্রান্তের মতো গিরিশ মা মা বলে কাঁদতে লাগলো।

মাঝরাত্তে বিছানার উপর উঠে বসলেন মা। গোপাল মাকে ডেকে তুলে বললেন, এখন একটু ভালো লাগছে। আমি যাবো।

বলরাম বসুর বাড়ীর পশ্চিম দিকের সরু গলিটা দিয়ে চলেছেন গিরিশের বাড়ী। পা চলে না। টলে টলে পড়ে যাচ্ছেন যেন, তবুও মনে অনমনীয় দৃঢ়তা। যেতেই হবে।

গিরিশের বাড়ীর খিড়কীর দরজা বন্ধ। আশু মাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সদরের দিকে গেল, কাউকে গিয়ে দরজা খোলাতে হবে।

মা একা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন,—আমি এসেছি।

সেই বাতাসের নিঃশব্দ কথাটুকু যেন কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি হয়ে বজ্রের মতো সকলের কানে গিয়ে বাজলো।

অমনি সকলে ছুটে এলো। দরজা খুলে গেল। সমস্ত বাড়ীতে আবার সাজ সাজ রব উঠে গেল, মা এসেছেন, মা এসেছেন। মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে উলু দিয়ে উঠলো। মহালগ্নের বাজনা বাজলো।

গিরিশের আনন্দ আর ধরে না।

কথায় বলে পালার বড়ো জ্বালা।

দিব্যি দিনগুলো কাটছিলো মায়ের। অভয় এসে বললো—দিদি এরা রইলো, এদের দেখো।

সেই দেখতে গিয়েই মাকে জড়িয়ে ধরলো। মায়া কি আর ছোট খাটো কথা। একবার ধরলে আর রক্ষে নেই।

ওই রাধুকে পালতে গিয়েই তো মায়ের এতো কষ্ট। নইলে কার কি। দিনরাত ওর চিন্তা করতে করতেই তো সময় চলে যায়।

সেই রাধু কিনা জিদ ধরেছে শ্বশুরবাড়ী যাবে। মায়ের শরীর খুব অসুস্থ। বার বার বারন করলেন—এখন যাসনি। কিন্তু রাধুও তেমনি। বেঁকে বসলো—বললো—তোমাকে দেখবার জন্যে তো কতো ভক্তরা আসে। আমাকে দেখবার মাত্র একটাই লোক আছে সে আমার স্বামী। এই আমি চললুম।

বলে আর পিছন ফিরলো না রাধু।

সোজা গিয়ে পাল্কীতে উঠলো।

শ্রীমা মনে মনে ভাবলেন—রাধু কি সত্যি সত্যিই মায়া কাটিয়ে চলে গেল? রাধুর মায়াতেই ত আমি আবদ্ধ আছি। ঠাকুর যদি ওর মায়া কাটিয়ে দেন তাহলে মহামায়াও যে চলে যাবেন। এখানে থাকবার তো আর কোনো শিকড় বন্ধন রইলো না।

রাধুর মা সুরবালা তো মাকে চোখের বিষ দেখে। যখন খুশী হয় যা তা করে গালাগালি করেন।

কিছু বলতে গেলেই বলে—তোমার ভাজদের তো ছেলেপুলে আছে

তাদের একটাকে নিয়ে থাকো না। আমার মেয়েটার উপর অত মায়া করছ কেন।

সুরবালার সব কথা মা নীরবে সহ্য করেন। তবুও মা-বাপ তুলে গালাগালি করে আকছার।

মা বলেন—তুই যে যখন তখন আমার মা-অন্ত, বাপ-অন্ত করে গালাগালি করিস, আমি তোর কথা গায়ে মাখিনা তাই, নইলে—তুই আমাকে সামান্য মানুষ বলে মনে করিসনি সুরবালা।

পাগলী সুরবালা অমনি বলে উঠলো—ওমা কখন আবার তোমায় গালাগালি দিলাম।

মা মনে মনে হাসেন। পাগল হলে কি হয় জ্ঞানটি আছে টনটনে। বলে—তোদের ভালোর জন্যেই আমি বেঁচে আছি রে। তোর মেয়ে তোরই থাকবে। তার মায়াতেই তো আছি। নইলে যখন খুশী আমি কেটে দিতে পারি দুনিয়ার সব বঁধন! হাওয়ার মতো কখন কোথায় উড়ে যাবো টেরও পাবি না।

সুরবালাকে মা একখানা গরদের কাপড় দিয়েছিলেন। সেই কাপড়ের প্রসঙ্গে রাধুর কথা উঠলো। অমনি সুরবালা রাগ করে কাপড়খানা ছুঁড়ে দিলো মায়ের গায়ের উপর। বললো—এই নাও তোমার কাপড়, দিয়ে দাও তোমার আর আর ভাজদের কাউকে।

স্মিতহাসিতে সুরবালার দিকে তাকিয়ে মা বললেন,—ওরে তোর চেয়ে আমার আর কে ভালো ভাজ আছে রে?

আমার উপর তোর এত অত্যাচার কেন? আমি তোর কে?

সুরবালা আর কথা কয় না। পিট পিট করে তাকায় মায়ের দিকে।

বাপের বাড়ী যাবার সময় সুরবালা অকারণ জিদ করে রাধুর গয়নাগুলো সঙ্গে নিয়ে গেল। সঙ্গে তারও দু-একখানা গয়না ছিল।

সুরবালার বাপের বাড়ী মাজটে গ্রামে। সুরোর বাবা জাহাবাজ লোক। সুযোগ বুঝে সেগুলো সরিয়ে দিলো।

দিনকয়েক পর শ্রীমার কাছে খবর এলো। সুরবালার বাবা তাদের সব গয়না মেরে দিয়েছে।

বাপ হয়ে মেয়ের গয়না মেরে দেওয়া। তাও অনাথ মেয়ে। শ্রীমার সহ্য হয় না। সুরোর বাপকে ডেকে পাঠালেন।

সুরবালার বাবা জয়রামবাটি এলে মা তাকে অনেক বুঝিয়ে পড়িয়ে অনুরোধ করলেন গয়নাগুলো ফেরৎ দিতে। সুরোর বাবা অচল অটল। তার সেই এক কথা, তার আমি কি জানি।

ইতিমধ্যে সুরবালা আবার মায়ের উপরেই চোটপাট করতে লাগলো। মাকেই শাসাতে লাগলো—তুমিই আমার গয়না আটকে রেখেছ।

তারপর সিংহবাহিনার মন্দিরে গিয়ে সুরবালা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো—মা আমার গয়না ফিরিয়ে দাও

সেখান থেকে অনেক দূরে সেই মন্দির। তবুও মা শুনতে পেলেন সুরোর কান্না। তিনি কলকাতায় চিঠি লিখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ললিত চাটুজ্জে আর মাষ্টার মশাই এসে হাজির। পুলিশের উপর ওয়ালার কাছ থেকে চিঠি এনেছে ললিত। গয়নাগুলো যাতে ফেরত পাওয়া যায় সেই নির্দ্দেশ।

দুজন চৌকিদার নিয়ে পাল্কা চড়ে ললিত গেল মাজটে গ্রামের দিকে।

মা আবার ভাবতে লাগলেন। মাষ্টারকে ডেকে বললেন,—তুমি একবার যাও। ললিতের বয়স কম, তারপর সরকারী পোষাক পরে এসেছে—তায় আয়ার বড় কত্তার চিঠি। কি করতে কি করে বসে বলা যায় না। দেখো যেন ব্রাহ্মণকে আবার অপমান করে না বসে। হাতকড়ি পরাতে বারণ করে দিও।

বদনগঞ্জের থানার বড়বাবু ললিতের চিঠি দেখে ভড়কে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে ললিতের সঙ্গে গিয়ে সুরোর বাবাকে ধরল। তারপর দুটো ধমক দিতেই সে সুড় সুড় করে গয়না বার করে দিল।

এদিকে মায়ের জ্বর এসেছে। রাত দুপুরে হৈ চৈ পড়ে গেল। ভীষণ মাথা ঘুরছে। সকলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। হঠাৎ এ আবার কি অঘটন ঘটলো।

—মা তোমার এমন কেন হলো ?

—বায়ূ গরম হয়েই হয়েছে। বললেন শ্রীমা—ওরা যে গয়না আনতে গেল, কি জানি বাপু, আবার ব্রাহ্মণকে অপমান করে বসে, সেই চিন্তা করতে করতেই আমার মাথা ঘুরে গেছে।

যার জন্যে এত ঝামেলা তারই জন্যে আবার ভাবনা ?

নইলে আর মা বলে কেন ?

মা হাসেন আর বলেন। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন একরকম হয়না, তেমনি আমার ছেলেরাও এক একটা এক একরকম। একদিন এক ছেলে প্রণাম করতে গিয়ে আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে এমন জোরে মাথা ঠুকে দিলে যে, আমি আৎকে উঠলুম যন্ত্রণায়।

সবাই বললো, কি হলো। তখন সেই ভক্ত ছেলে বলে কি জানো ? বললে—এমনি তো মা আর মনে রাখবে না, তাই দিলুম একটু ব্যাথা দিয়ে। ব্যাথার কথা মনে পড়লেই ছেলের কথা মনে পড়বে।

মা তাই হাসেন। হাসেন বেদনার আনন্দে। বলেন,—তাকে কি অত সহজে ভোলা যায়।

দুজন ভক্ত শ্রীমার জন্যে দুখানা কাপড় এনেছে।

মাকে প্রণাম করে পায়ের উপর রাখলো তারা দুখানা কাপড়। প্রাণভরে মা তাদের আশির্বাদ করে বললেন—বাবা, একে তোমাদের অবস্থা খারাপ তারপর আবার এত খরচ করতে গেলে কেন ?

ছেলে দুটি সঙ্কুচিত হয়ে গেল বুঝি নিজেদের মধ্যে। ধীরে ধীরে উত্তর দিল তারা— তোমার কত বড়লোক ছেলেরা আছে, তারা দামী দামী কাপড় দেয়, আমাদের যে এই মোটা কাপড়ের চেয়ে বেশী ক্ষমতা নেই মা!

শ্রীমা অমনি কাপড় দুখানি হাতে তুলে নিয়ে বললেন—না বাবা অমন কথা বলোনা। এই আমার গরদ, এই আমার লাখ টাকা।

এক ভক্ত এসেছে কতকগুলি গোলাপের কুঁড়ি আর কতকগুলি জবাফুল নিয়ে। মা তাকে কাছে ডাকিয়ে বললেন।

—আমি তো কোন যুগীকে মন্ত্র দিইনি কখনো। বললেন মা!

কথা শুনেই ছেলেটি চমকে উঠলো। খুবই আঘাত পেলো মনে। অশ্রুভরা চোখে তাকালো মায়ের দিকে। মনে মনে বললো—আমার পদবীর সঙ্গে নাথ 'নাথ' কথাটা জোড়া রয়েছে বলে আমি দোষী হবো? আর তুমি যে অনাথের নাথ 'তাতে বুঝি দোষ হয়না।'

মা বললেন—তোমাদের তো কুলগুরু রয়েছেন, তার কাছ থেকে দীক্ষা নাওগে যাও।

ছেলেটি আর কি করে। চোখের জলে তার সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। মাথা নীচু করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চললো।

এমন সময়ে পিছন থেকে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন একজন ব্রহ্মচারী তাকে ডাকছে। আবার ফিরে চললো শ্রীমার কাছে।

—এসো বাবা, বসো। বসলেন শ্রীমা. তোমরা তো কৃষ্ণমন্ত্রী? তাহোক, বোসো ঐ আসনে দীক্ষাটা দিয়ে দিই

আনন্দের অশ্রু আবার গড়িয়ে পড়লো ভক্তের দুই গণ্ড বেয়ে।

আর একজন ভক্ত এসেছে মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে।

সদর দরজায় এসে সে বাধা পেল। সেবকেরা বাধা দিল। ভিতরে ঢুকতে দেয়া হবেনা।

আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। সেই বরিশাল থেকে।

তা হোক। যখন তখন যাকে তাকে ভিতরে যেতে দেওয়া হবে না।

শুরু হলো তর্কাতর্কি, ঝগড়া, হৈ চৈ।

ভক্তটি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে মার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাবে না। তার জন্যে যদি দরকার হয় তো অনশন করবে এইখানে বসে।

তবে অনশনে বসবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে যাবে সে। এখনও সে একেবারে শক্তিহীন নয়।

এমন সময় শ্রীমা এসে দরজার সামনে দাড়ালেন।

কি ব্যাপার ? প্রশ্ন করলেন মা।

—স্বামী সারদানন্দের বারণ আছে যাকে তাকে সব সময় ভিতরে যেতে দিতে। তাই আমরা ওকে আটক করেছি। বলল সেবকরা।

শ্রীমা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—শরৎ বারণ করবার কে ? ভক্ত যদি দুয়ার থেকে ফিরে যায় তাহলে আমার থাকবার দরকার কি ?

তারপর ভক্তটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি আজ গিয়ে কিছু খেয়ে নাও। কাল এসো আমি দীক্ষা দেব।

একসঙ্গে দুজনেরই কথা বজায় রইলো।

স্বামিজী আর মহারাজ।

নরেন আর রাখাল। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ দুটি শিষ্য।

শ্রীমার কাছে এলেই নরেন ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। আর মহারাজ পারতপক্ষে মার কাছে যেতে চাইতো না।

স্বামীজি একবার সারদানন্দকে বললেন,—তোরা যে এত মা মা করিস তা কি শুধু গুরুমা বলে ?

—তা কেন ! বললেন সারদানন্দ,—ঠাকুর আর শ্রীমা অভেদ বলে।

স্বামিজী শ্রীমার কাছে গেলেই আগে থেকে গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হয়ে যেতেন।

আমেরিকা থেকে ফিরেও গেলেন মাকে দর্শন করতে।

আশির্বাদ করে শ্রীমা বললেন,—তুমি যা করেছ, এমনটি আর কেউ করেনি।

স্বামিজী হেসে বললেন,—কি সব ছাই পাঁশ বলছমা? আমি আর কি করলাম। তুমি যা করিয়েছ তাই করেছি আমি। তুমি ইচ্ছে করলে আমার মতো হাজার হাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারো।

বাধু আবার মল পরেছে।

দিনরাত ঝলমল করে ঘুরে বেড়ায় এখান থেকে সেখানে। সারা বাড়ী ঝলমল করে রাধুর পায়ের মল।

এমনিতে কোথাও একটা থালা বাসনের ঠুন করে ওঠা শব্দ সহ্য করতে পারেন না শ্রীমা তার উপর রাধুর ঝম ঝম তবু মা কিছু বলেন না রাধুকে।

অন্য ভক্তরা মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মা কিন্তু নির্বিকার।

সেদিনও রাধু মল পায়ে ঝম ঝম করে দোতলা থেকে নামছে।

মায়ের কানে এসে বাজালো শব্দটা মা তখন উপরের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকালেন। আশপাশে যারা ছিল তারা ত মা'র চাহনি দেখে পাথর হয়ে গেল ভয়ে.

রাধু কিন্তু বেপরোয়া।

তেমনি ছুটে ছুটে, লাফিয়ে, লাফিয়ে, জোর শব্দ করতে করতে নেমে এলো।

—তোর আক্কেলের বলিহারী, রাধু। নিচেয় এতগুলো সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই কিনা অমনি করে নেচে নেচে বেড়াবি? এখুনি পায়ের মল খুলে ফেলে দে।

রাধুও তেমনি। মলগুলি ছুঁড়ে দিল মায়ের দিকে।

ভাগ্যিস মার গায়ে এসে লাগেনি সজোরে ছোঁড়া মল জোড়া।

আবার সেদিন মাথায় ভিজে গামছাটা বেঁধে চাপা দিয়ে চুলে পাতা কাটতে বসেছে রাধু।

মা দেখে বললেন,—ওকি করছিস রাধু। অমনি করলে বুঝি খুব সুন্দর দেখায় ভেবেছিস ? আমিত জীবনে চুলই বাঁধিনি। মাঝে মাঝে গৌর দাসী জোর করে বেঁধে দিত ; তা আমি কি বেশিক্ষণ রাখতে পারতাম ? তখুনিই খুলে ফেলতাম।

পাশ থেকে গোলাপ মা বললে—তোমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি তো মুক্তকেশী। তোমার আবার চুল বাঁধা কিসের।

কামারপুকুর দেখে এক ভক্ত ফিরে যাচ্ছিল। পথে যেতে যেতে মনে হলো এতদূর এসে একবার মাকে দর্শন করে না গেলে যেন তার এই আসাটা পুর্ণতঃ পায় না।

প্রচণ্ড কাঠফাটা রোদ। মাঠের দিকে তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। তবুও মায়ের নাম করতে করতে ভক্তটি এসে পৌঁছলো জয়রামবাটিতে।

এসে পৌঁছতেই অন্যান্য ভক্তরা অনুযোগ করে আগন্তুক ভক্তকে বলল,—কি দরকার ছিল এই জ্বলন্ত ভাঁটি মাথায় করে এসে। ওদিকে তুমি রোদ্দুরে পুড়ছ, আর এদিকে ঘরে বসে মা চীৎকার করছেন—রোদ্দুরে জ্বলে গেলুম রে, জ্বলে গেলুম।

একজন ভক্ত এসে মাকে প্রশ্ন করে—এত জপ তপ করলাম, কিছুই তো হলনা, মা।

তার বলবার ভঙ্গীটা যেন তার কিছু না হওয়ার কারণ হলেন শ্রীমা।

মা বললেন—একি শাক মাছ বাবা ? যে গিয়ে অমনি নগদ পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে আসবে। বিশ্বাস রাখো, ধৈর্য্য ধরো তাহলেই পাবে। চন্দন ঘষে ঘষে গন্ধ বার করো। ঠাকুরের কৃপা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করো।

আবার একজন বৃদ্ধ এসে বলছে মন্ত্র নিতে এলাম।

—তা এখানে কেন?

—শুনেছিলেম রামকৃষ্ণ নামে একজন মস্তবড় সাধু ছিলেন, তাঁকে ত আর দেখতে পেলাম না। শুনলাম তাঁর স্ত্রী নাকি কিছু শক্তি পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে; তাই সেই স্ত্রীর কাছ থেকেই মন্ত্র নেব মনস্থ করে এসেছি।

শ্রীমা অবাক হলেন। লোকটা বলে কি?

ঠাকুর কি শুধু সাধুই ছিলেন? তিনি যে স্বয়ং ঠাকুর!

বৃদ্ধ বললো—তা আর কি করবো, যাকে দেখিনি তাকে ছোট বা বড়ো বলি কেমন করে। যাকে সামনে চাক্ষুষ দেখেছি তাকে ধরাই তো বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি।

যোগেন মা'র দিকে তাকিয়ে শ্রীমা বললেন,—ও যোগেন, এ বলে কি শুনছ? এ যে ঠাকুর মানে না। কি করি এখন?

যোগেনমা বলে—ওকে মন্ত্র দাও। তোমার মন্ত্রের বল কি তা তো জানেনা।

ধরতে গেলে আসলে মাটি আর পাথর একই। মন্ত্রের গুনে মাটি পাথর হয়েছে। পাথর হয়েছে মাটি।

মন্ত্র পেল ভক্ত। তখন সে চিনতে পারল রামকৃষ্ণকে।

কে রাম আর কে রামকৃষ্ণ অথবা সাধু।

মন্ত্রের মতই মন্ত্র বিতরণ করেন শ্রীমা। উপবাসী জীবনের পরমান্ন সেই মন্ত্র। মায়ের মন্ত্র দেবার স্থান কাল বিচার নেই। যে যেখানে যেমন ভাবে পেতে চায়। ঘরে, বারান্দায়, ছাঁদনা তলায় অথবা মাঠে বা গাছতলায়।

সবশেষে মা বলে দেন, মন্ত্র নাও আর যা করো আমার মন্ত্রটির সার মনে রেখো। মনে রেখো ঠাকুরই সব। সবই ঠাকুরের, তিনিই

প্রধান, তিনিই ঈশ্বর। আমি শুধু তাঁর কাজ করছি। আমি কেউ নই। আমি শুধু সন্তানের মা।

তাই প্রণাম শেষ করতে ভক্তকে আশির্বাদ করে কুশল জিজ্ঞাসা করেন—ভক্ত বলে—আপনার আশির্বাদে ভালোই আছি।

অমনি মা বিরক্ত হলেন যেন!

—ওইটা তোমাদের সবচেয়ে বড়ো দোষ। সব কথায় আমাকে টানো কেন! আগে ঠাকুর না আগে আমি? তাঁর কথা বলো, তাঁর কাছে করুণা প্রার্থনা করো!

সে তোমরা যাই বলোনা কেন ভালোবাসার মত দীক্ষা নেই, আর কান্নার মত মন্ত্র নেই।

প্রাণখুলে যদি কাঁদতে পেরেছ, পেরেছ যদি গভীরভাবে ভাল বাসতে তাহলেই একশো বছরের কাজ পলক মাত্রে হতে পারে; তাহলেই তোমার সব হলো।

তাই বলি, কাঁদো আর ভালোবাসো। কেঁদে কেঁদে ভালোবাসো আর ভালোবেসে কেঁদো।

মাঝি বৌ অনেকদিন পরে এসেছে!

বিষাদ মুখে প্রণাম করে মাকে। তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন শ্রীমা—এতদিন পরে এলি? কি হয়েছিল তোর।

বলতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়লো মাঝি বউয়ের। কান্নাজড়ানো গলায় বললে—আমার সেই রোজগেরে জোয়ান ছেলেটা মারা গেছে গো মা।

সে কি?

যেন দীর্ঘদিন পরে আপন সন্তানের মৃত্যু সাংবাদ পেলেন মা! অমনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সে কান্না আর থামতে চায় না! বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলেন মা।

মায়ের কান্নার শব্দ শুনে চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো।

কি ব্যাপার কি হয়েছে। সকলে প্রশ্ন করে।

মায়ের কান্না থামেনা। মাঝি বৌ-এর বুকের সেই নিরুদ্ধ কান্না যেন আজ মুক্তি পেয়েছে। সমস্ত শোক যেন নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন মা।

মাঝি বৌ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

যেন মা'র নিজের ছেলে মারা গেছে, আর তাঁকে স্বান্তনা দেবার কাজ যেন মাঝি বৌ-এর।

মাঝি বৌ তাই মাকেই স্বান্তনা দিয়ে বলে— তুমি আর কেঁদোনা, মা। যাঁর ছেলে, যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়ে গেছেন। এবার বুঝতে পারছি মা, সবই তাঁর। তোমার আমার বলে আর কিছুই নেই।

নিবেদিতা এসেছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

সময়টা আবার রাত্রি।

মায়ের কাছে এসে কি যে করবে তা যেন ভেবেই উঠতে পারে না নিবেদিতা। কখনো বা আলোটার সামনে কাগজ দিয়ে আলোর রশ্মিটা যাতে মা'র চোখে না লাগে তার ব্যবস্থা করছে, কখনো বা অন্যকিছু করছে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে।

তারপর মায়ের কাছে এসে অতি আলগোছে প্রণাম করলে মায়ের পায়ে। এতো আলতো ভাবে হাত দিলো যেন জানতেই পারা যায় না।

সেই নিবেদিতা সরস্বতীপূজোর দিন খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে কাজ কর্ম দেখা শোনা করতে লাগলো।

অঞ্জলি দিয়ে কপালে দিয়েছে হোমের ফোটা।

তার সেই সাদা আগুনের মত চেহারা যেন টক টক করছে। সাদা রঙের উপর কৃষ্ণবর্ণ হোমের ফোঁটা যেন পূর্ণিমায় চন্দ্রের মত জ্বল জ্বল করছে।

মা বলেন—কার সাথে কার তুলনা করছ। ও যে সাক্ষাৎ দেবী।

দেখছ মা সামান্য একটা উলের পাখা তৈরী করে দিয়েছি, তাই নিয়ে·কি কাণ্ডটাই না করছে-।

মায়ের নিজে হাতে তৈরী উলের পাখাটি পেয়ে নিবেদিতার সে কি খুশী। যে আসছে তাকেই দেখাচ্ছে—দেখ আমার মা আমাকে কি চমৎকার, কি সুন্দর একটা জিনিষ দিয়েছেন।

পাখাটি নিয়ে কি যে করবে তা যেন ভেবেই পায়না।

একবার মাথার রাখছে, একবার বুকে রাখছে, আবার কখনো নেড়েচেড়ে একটু হাওয়া খাচ্ছে মুখের কাছে।

পাখাটা পেয়ে তার গর্ব কতো। মা তাকেই দিয়েছেন।

এই না হলে ভক্তি, ওর দেহটা সাদা, ওর মনটা তার চেয়েও ধপধপে সাদা। একটা সামান্য জিনিস নিয়ে কি অসমান্য আনন্দ।

ঠাকুর বলতেন, বুড়ো হওয়া আমার পোষাবে না।

লোকে বলবে, ঐযে রাণী রাসমনির বাড়ীতে একটা বুড়ো থাকে। সে আমার সহ্য হবে না বাপু।

শ্রীমা সেই কথার উত্তরে বললেন, ও কথা বলতে নেই। তবুও লোকে তোমাকে পরাধীন ভাবে।

ঠাট্টার সুরে ঠাকুর বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ থাক। বলি চণ্ডীদাসের গল্প জানো? শোন তাহলে—

ছোটবেলায় চণ্ডীদাস ছিল একেবারে গণ্ড মুখখু; লেখা পড়া একেবারেই করতে চাইতো না। একদিন তার বাবা রেগে গিয়ে চণ্ডীদাসের মাকে বললেন, চণ্ডটাকে আর ভাত দিতে পারবে না। আজ খেতে বসলে ওর থালায় এক মুঠো ছাই দেবে।

মা আর কি করেন, তাই করলেন।

কিন্তু শুধু ছেলের পাতে দেন কি করে।

খেতে বসে চণ্ডীদাস দেখল ভাতের পাশে তার থালায় এক মুঠো ছাই দেওয়া হয়েছে!

—এ কি মা? প্রশ্ন করে চণ্ডীদাস।

—কি করবো বলো, তুমি একেবারে লেখাপড়ার নামটও নাও না, তাই তোমার বাবা তোমাকে ছাই খেতে দিতে বলেছেন। আমি মা হয়ে একেবারে ছাই দিই কেমন করে। তাই দুটি ভাতও দিয়েছি ঐ সঙ্গে।

সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করে উঠে গেল চণ্ডীদাস।

ক্ষোভে দুঃখে তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। অভিমান করে সে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

তারপর মনের দুঃখে মা বাশুলিকে ডাকতে লাগলো।

মা বাশুলী দেখা দিলেন।

বললেন,—তোর মুর্খতা ঘুচে যাবে, তুই গান গাইতে পারবি।

সত্যি সত্যি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে যেন সরস্বতী ভর করলেন। চমৎকার গান গায় চণ্ডীদাস। যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

পুকুরঘাটে যেখানে মেয়েরা স্নান করে চণ্ডীদাস তার কাছে বসে গান গায়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সকলে।

নিন্দুকের দল নানা রকম নিন্দা রটিয়ে বেড়ায়। বলে চণ্ডীদাস বয়ে গেছে।

কথাটা রাজার কানে উঠলো। তিনি ডেকে পাঠালেন চণ্ডীদাসকে।

গান শুনে রাজাও মুগ্ধ হলেন। চণ্ডীদাসের দুঃখের রাত পোহালো। দিকে দিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। অপবাদও চাপা পড়ে তলিয়ে গেল কোথায়।

এদিকে চণ্ডীদাসের বয়স হয়েছে। চণ্ডীদাসের বুড়ো হয়েছে। যুবতী রমণীরা আর এক প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় না তার দিকে।

মেয়েরা যারা আসে তারা চণ্ডীদাসকে বাপ বলে, এতে চণ্ডীদাস

বড়ই দুঃখিত। তাই তিনি তার দোঁহাতে এক জায়গায় খেদ প্রকাশ করে লিখেছেন।

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাস
এ বড় বিষম তাপ।
যুবতী আসিয়া শিয়রে বসিয়া
আমাকে কহিবে বাপ।

কথা শেষ করে ঠাকুর বলেন—না বাপু, আমি বুড়ো হতে পারবোনি।

উপস্থিত সকলে ঠাকুরের রসিকতায় প্রাণভরে হাসতে লাগলো।

শ্রীমা বললেন,—তিনি তো দিব্যি চলে গেলেন। আর যত ব্যাথা আর বোঝা চাপিয়ে দিলেন আমার মাথায়।

তাঁরই অনুগ্রহে মাথায় তুলে নিলাম জ্বরা ব্যাধি, সংসার জ্বালার যন্ত্রণা সব। সকলের বিষ ধারণ করে করেই তো আমার আজ এই হাল হয়েছে।

কিন্তু না নিয়েও তো উপায় নেই।

ঠাকুরের কাজ সানন্দে, সাগ্রহে মাথা পেতে নিতে হবে আমাকে আমি যে নারী। আমি যে মা। পাপ তাপ বিনাশিনী মুক্তিদাত্রী।

এই ছাখোনা, সাত সমুদ্দূর তেরো নদী পার হয়ে আপন বলে সব ছেড়ে দিয়ে এতদিন নিবেদিতা ছিল আমার কাছে। সেও চলে গেল।

শ্রীমা বললেন,—যে ভালো লোক হয় তার জন্যে অন্তরাত্মা কাঁদবেই আর ভালো লোক তারেই বলা যায়, যে ভালোবাসে।

এই দেহ, স্বামী, পুত্র, পরিবার এ সবাই মায়ার বন্ধন। এ সব কাটাতে না পারলে তোমার পরিত্রাণ নেই। এ সবের কোনো দামও নেই। যাই করো আর যাই ভাবো শরীরটা পুড়লে দেড়সের ছাই বই তো আর কিছু নয়। তার জন্যে এত গরব কেন?

তাই বলি দেহটাকে না ভালবেসে দেহের মধ্যে যে দেহী রয়েছেন তাকে ভালোবাসো।

সারা দেহ জুড়েই তো রয়েছেন তিনি ভেবে দেখ। হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে? বেদনার হাঁটু থেকে মনটা তুলে নাও। দেখ আর হাটুতে ব্যথা নেই।

যোগেনমা বললেন ঠাট্টার স্বরে—ঠাকুরের শিষ্যগুলো দেখ এক একটা বিরাট পুরুষ যেন এক একটা সূর্য। আর তোমার শিষ্যগুলো সব চুনোপুটি।

মা হেসে বললেন,—তা আর কি করবো বলে। ঠাকুর নিজের বেলায় দেখে শুনে বাছাই করে রুই কাতলাগুলো রেখে আমার জন্যে যত চুনোপুঁটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদের ত আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না। ওদের সঙ্গে তুলনা করো না। ওরা সব সার বাঁধা পিঁপড়ে। নইলে আমি মা কিসের? আমার কাছে ঐ সব গরীব গুবোর দলই তো আসবে। কেষ্ট বিষ্টু আমি কোথায় পাবো। যারা যোগ্য তাদের তো ঠাকুর উদ্ধার করলেন। আর যারা অযোগ্য তাদের জন্যই ত তাদের এই মা রয়েছে।

মা নিজের হাতে ফুলের মালা গেঁথেছেন। ঠাকুরের ছবিতে সেই মালা পরাবেন।

বিকেলে গা ধুয়ে এসে বসলেন ভোগ দিতে। বিকেলের ভোগ।

তার আগে কে একজন ব্রহ্মচারী ছেলে রসগোল্লা এনে রেখে গেছে। সেই রসগোল্লার রস গড়িয়ে গিয়ে মালায় লেগেছে। আর পিঁপড়ের ঝাঁক এসে ছেঁকে ধরেছে সেই মালাকে।

তাই দেখে মা চীৎকার করে উঠলেন,—ঠাকুরকে যে পিঁপড়েয় কামড়াবে।

তারপর বসলেন সেই ফুল থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে ফুলের মালাকে কীটশুন্য করে তবে মালা পরালেন ঠাকুরের ছবিতে।

সুরবালা ছিল দূরে দাঁড়িয়ে।

মাকে মালা পরাতে দেখে পরিহাস করে বলে উঠলো।

একজন সন্ন্যাসী দুগাছি বড় গড়ের মালা পাঠিয়েছে। শ্রীমা পূজোর সময় পরিয়ে দিলেন ঠাকুরের ছবিতে।

তারপর সন্ন্যাসীকে মা বলেছিলেন—অত ভারী মালা আর পাঠিও না। ঠাকুরের বড্ড লাগবে।

ঠাকুরের ভোগ দেবার সময় হয়ে গিয়েছে।

মা লজ্জাবতী বধূটির মত চুপি চুপি ঘরে গিয়ে ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—খাবে এসো।

তার পাশেই রয়েছে গোপালের বিগ্রহ মা তাকেও বললেন, এসো খেতে এসো।

এমন সময় একজন ভক্ত মেয়েকে সামনে দেখতে পেয়ে মা বললেন,

—সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

ভক্ত মেয়েটি লক্ষ্য করল মা চলেছেন এমনভাবে, যেন যাদের ডেকে এলেন, তাঁরা মায়ের পিছনে পিছনে চলেছেন।

বৃন্দাবন থেকে এসে কামারপুকুরেই রইলেন শ্রীমা।

চরম দারিদ্রতার মধ্যে কাটছে দিনগুলো। এমন এক একটা দিন আসে যে, একটু নুন জোটেনা।

দেহ রাখবার আগে একদিন ঠাকুর বলেছিলেন—আমি চলে যাবার পর তুমি কামারপুকুরেই থেকো। শাক ভাত যা জোটে তাতেই পেট চালিয়ো আর দিনরাত হরিনাম কোরো।

মা তাই বাড়ির সামনে নিজের হাতে কোদাল কুপিয়ে দুটো শাক ফলান। নিজেই চাট্টি ধান কুটে চাল তৈরী করে এনে ভাত রাঁধেন।সেই ভোগ আগে ঠাকুরকে নিবেদন করেন তারপর নিজে দুটো মুখে তোলেন।

তাতেই মায়ের প্রসন্ন বদন। এতটুকু অভিযোগ নেই, বিষাদ নেই চোখে মুখে।

খবর পেয়ে শ্যামাসুন্দরী সংবাদ দিলেন একবার দেখে যাবার জন্য।

মেয়ের চেহারা দেখে শ্যামাসুন্দরী চমকে উঠলেন। বললেন একি চেহারা করেছিস, সারদা?

একেবারে ভিখারিনীর মূর্তি! রুক্ষ জট পাকানো চুল ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি। মলিন চেহারা।

মেয়ের হাত ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে শ্যামাসুন্দরী বললেন,—তুই এ কি হয়েছিস, মা. আর তোর ওখানে গিয়ে কাজ নেই, এখানে আমার কাছে থাক আয় আমি তোর চুলে তেল মাখিয়ে দি।

সারদামণি বললেন, ও সবের দরকার নেই মা। ঠাকুর আমায় যেমন রেখেছেন আমি তেমনিতেই সুখী।

তাহলে কি করবি তুই?

—কি করব? কামারপুকুরে ফিরে যাবো। তারপর? তার পরের ব্যবস্থা ঠাকুর করে রেখেছেন. তিনি যেমনি বোঝেন তেমনি করবেন।

ঠাকুর বলেছেন, আমাকে যে স্মরণ করে, তার খাওয়া পরার কষ্ট হয়না।

তাঁকে স্মরণ করলে দুঃখ দুর্দশা দূর হয়।

সত্যিই তাই!

মায়ের ভাই প্রসন্নকুমার কলকাতায় থেকে পুরুতগিরি করেন. তাঁর কানে গিয়ে উঠলো কথাটা।

তারপর খবর গেল গোলাপ মার কানে। গোলাপ মা শুনলো —মায়ের তেল— নুনটুকুও জুটছে না। মা রয়েছেন অর্দ্ধাহারে, উপবাসে দীনদুঃখীর মতো।

সঙ্গে সঙ্গে গৃহী ভক্তদের মধ্যে চাঁদা উঠতে লাগলো।

তারপরই চিঠি গেল মায়ের কাছে। কলকাতায় এসে থাকবার জন্য অনুরোধের পর অনুরোধ।

তারা বলে তুমি যদি আমাদের মা হও তাহলে আমাদের কাছেই থাকতে হবে তোমাকে। আমরাই তোমার ভার নেবো। সন্তান থাকতে মা কেন কষ্টে থাকবে ?

এদিকে গ্রাম্যসমাজে আবার আলোড়ন উঠলো।

নানাজনে নানা কথা বলতে কসুর করলো না।

মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সের বিধবা। সে কি করে থাকবে অনাত্মীয় ঐ সব ভক্তদের সাথে। তারা তো সব অল্প বয়সের ছেলে।

মা একটিও কথা কননি। চুপ করে শুনে যান।

বুঝতে হবে, জানতে হবে সমাজের হাওয়া কোনদিকে বয়।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না মাকে।

এবারে ত্রাণকর্ত্রী রূপে এলো প্রসন্নময়ী। সকলের সামনেই মাথা উঁচু করে বললে, ওদের কথায় তুমি কান দিও না। ওরা গদাইয়ের মর্মই বুঝতে পারলো না তায় তার স্ত্রীর মর্ম বোঝা দূরের কথা।

গদাইয়ের স্ত্রী যে আরো কঠিন। আরো দুর্গম। আরো দুর্বোধ্য।

শ্যামাসুন্দরী প্রথমদিকে একটু অমত করলেও পরে সরলমনেই মত দিলেন। প্রসন্নময়ীর মুখের সামনে আর কারও রা-টি করবার যো রইল না

শ্রীমা চলে এলেন কলকাতায়।

উদ্বোধন অফিস তৈরী হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগলো।

ততদিন মা বাগবাজারের ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দু চারদিন বলরাম বোসের বাড়ীতে বা মাস্টার মশাইয়ের বাড়ীতে থেকে এলেন। তারপর উদ্বোধন অফিস তৈরী হলে উঠে এলেন সেখানে।

ঠাকুর বলতেন,—আর যাই করো, কামারপুকুরের বাড়িটি ছেড়ো না।

বাড়িটা যেন খাড়া থাকে ভক্তরা তোমাকে যতবড় অট্টালিকা দিক না কেন কামারপুকুরের কুড়ে ঘরটি ভুলো না যেন।

মা কখনই ভোলেননি কামারপুকুরের সেই ঘরটি।

এটা ওটা টুক-টাক করে ঠিক ছবিটির মত সাজিয়ে রেখেছেন। একদিনের জন্যেও ভোলেননি।

এক ভক্ত একদিন প্রশ্ন করে বসল,—মা, এ কেমন কথা। কলকাতা থেকে ছাড়া পেলেই চলে যান বাপের বাড়ী, কই কামারপুকুরে ত বহুদিন যাননি ?

মা অমনি বললেন, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে সব কিছু দেখতে পাই, কেবল ঠাকুরকে ছাড়া, তাই বড্ড কষ্ট হয়। নইলে ঠাকুরের বাড়ী তো আমার ঠাকুরবাড়ী। সেই তো আমার স্বর্গ।

একটি ছেলে সঙ্গে নিয়ে একজন স্ত্রী ভক্ত মাকে দেখতে এসেছে।

—এটা আবার কে ? প্রশ্ন করলেন মা।

—একে আমি মানুষ করব। বাচ্ছাটার উপর বড্ড মন পড়েছে।

অমনি মা যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—ওমা অমন কাজও কোরনা। এই দেখ রাধুকে নিয়ে আমার কি দশা হয়েছে।

একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভালোবেসো না। সংসারে বাস করতে হলে যার উপর যেমন কর্ত্তব্য শুধু হাসিমুখে সেইটুকু করে যাও। আর কাউকে ভালোবেসেছ কি পরিণামে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

বিষ্ণুপুর থেকে কোতুলপুর চলেছেন গরুর গাড়ীতে। সঙ্গে চলেছে রাধু।

প্রায় কাছাকাছি এসেছেন এমনি সময়ে পা দিয়ে মাকে ঠেলতে লাগল রাধু।

বললে,—সর, সর বলছি। তুই এইখানে নেমে যা।

মা আর কি করেন নিজে গাড়ীর ভিতর দিকে সরে গেলেন। রাধু তখন বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে।

মা বললেন, আমি গেলে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে ?

রাধু অমনি মাকে সরাসরি লাথি মেরে বসলো।

—ও রাধু তুই এ কি করলি ? চমকে উঠলেন মা, তক্ষুনি নিজের পায়ের ধূলো নিয়ে রাধুর মাথায় দিয়ে দিলেন।

উড়িষ্যাবাসী এক সাধু এসেছে কামারপুকুরে।

মা তাকে খুব ভালবাসেন। খুব আদর যত্ন করেন।

চাল, ডাল যা জোটে সাধুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসেন সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কেমন আছো সাধুবাবা ?

সাধুবাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। মনে মনে ভাবে এ কণ্ঠস্বরটি কার ? এ স্বর তো খুব চেনা জানা মনে হচ্ছে, যার জন্যে এই সাধ্যি-সাধনা এ বোধ হয় সেই কণ্ঠস্বর।

সাধু মনের অভিলাষ প্রকাশ করেন এখানেই থাকবেন জীবনের শেষ কটা দিন। গ্রামের লোকেরা চাঁদা করে জিনিষপত্র জোগাড় করে ছোট্ট একটা কুটির তৈরী করবার ভার নিলো।

সাধুর ঘর তৈরী হতে শুরু হলো। কিন্তু রোজ লেগে রইলো ঝড় বৃষ্টি। সামান্য জিনিষপত্র তছনছ হয়ে যেতে রইলো রোজই।

এমনি করে সাধুর ঘর বুঝি শেষ হয়না।

হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন মা,—ঠাকুর, আগে সাধুর ঘরখানা তৈরী হতে দাও তারপর যত পারো বৃষ্টি দিও।

ঠাকুর শুনলেন মায়ের প্রার্থনা। বৃষ্টি থামলো। সাধুর কুঁড়েঘর তৈরী শেষ হলো।

সাধুর মাথা গোজার আশ্রয় হ'লো।

শুধু মাথা নয়, দেহ রাখবার ঠাঁই। দিন কয়েক পরে সাধু সেই ঘরেই দেহরক্ষা করলেন।

তোতাপুরী একবার বলেছিল ঠাকুরকে,—স্ত্রীকে কাছে না রেখে অর্থাৎ নিজেকে স্ত্রী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে খুব কামজয়ের বড়াই করছ। বুঝতাম তোমার স্ত্রীকে সঙ্গিনী করে রেখে বড়াই করতে, তবেই না বাহাদুর।

ঠাকুরের সামনে অগ্নি পরীক্ষা।

তোতাপুরীর কথাটাও ভেবে দেখছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করেননি।

সারদা থাকেন নবহৎ ঘরে। আর থাকেন চন্দ্রমণি। ঠাকুর ডেকে পাঠালেন।

বললেন,—আজ থেকে তুমি এই ঘরে শোবে।

চন্দ্রমণি ভাবলেন, গদাইয়ের বুঝি সংসারে মতি ফিরল।

ঠাকুর নিজের শয্যায় বসে মনের সঙ্গে তর্ক করছেন।

পাশের ভিন্ন শয্যায় শিশুটির মত লজ্জায় জড়সড় হয়ে শুয়ে আছেন সারদা।

ঠাকুর মনকে বললেন—এই নারীকে সংসার ভোগবতী করেছে! তুই তাকে ভগবতী বলে গ্রহণ করতে পারবি না।

নিশ্চয় পারবি। পারা না পারা তো তোর হাতের মুঠোয়। তোর ইচ্ছার অন্তর্গত।

সবাই যা করে তুই তা করবি কেন।

সকলেই তো স্ত্রীকে বর্জন করেছে। নয়তো ভয়ে ভয়ে অর্জনই করেনি।

তোর তা করলে চলবে না।

ভবনেশ্বরীকে দেখবি তুই ভুবনেশ্বরীরূপে, আজ থেকে তাই হবে তোর সাধনা। জগতের সামনে স্ত্রীর সত্যিকার মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তোকে।

মন বলে—সারদা যদি চিরন্তন নারীর মত মোহিনী রূপ ধরে ?

ঠাকুর প্রার্থনা করলেন—না না। মাগো, আমার স্ত্রীর মন থেকে কামভাব দূর করে দে, মা।

মাঝে মাঝে মাঝরাতে সারদার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

চুপি চুপি ঘোমটাটি সরিয়ে ভালো করে দেখেন ঠাকুরকে।

নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে ঠাকুর তাঁর খাটের উপর বসে আছেন।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন সারদা—ঠাকুর নড়ছেন না।

আবার দেখলেন ভালো করে। না পাষাণের মত শক্ত হয়ে গেছেন যেন।

অমনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সারদা।

বারান্দায় কালীর মা শুয়েছিল সারদা তাকে ডেকে তুলে সব বললেন।

কালীর মা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল হৃদয়কে।

হৃদয় ঠাকুরের কাছে বসে ঠাকুরকে মন্ত্র শোনাত।

মন্ত্র শুনে ঠাকুরের দেহে যেন প্রাণ এলো। ধীরে ধীরে নিশ্বাস প্রশ্বাস বইতে সুরু করলো। সমাধি ভঙ্গ হলো ঠাকুরের।

তারপর রামকৃষ্ণ নিজেই সারদাকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। সব বুঝিয়ে দিলেন, কোন কোন লক্ষণে মন্ত্রপাঠ করলে সমাধি ভঙ্গ হবে।

মায়ের যেন আনন্দের সীমা নেই।

ঠাকুরের সাধনার চাবি কাঠি পেয়েছেন নিজের হাতে।

লোকের কথামত সারদা বললেন ঠাকুরকে,—একটা ছেলেপুলে রইলো না, সংসার ধর্ম বজায় থাকবে কেমন করে।

ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন তিনি কি বলতে চান।

অতপঃর পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন মাকে,—একটা ছেলের জন্য এত বিচলিত হচ্ছ কেন। তোমার এত ছেলে হবে যে মা মা ডাকের চোটে তিষ্টতে পারবে না।

পরবর্তীকালে মা সারদামণি বলেছেন,—তাই তো ছেলে গুণে শেষ করতে পারছি না, কত দেশ-বিদেশ থেকে কত ছেলে আসছে আমার কাছে।

হাতের কাছে নরেন বাবুরাম তো রয়েছে। ওরা কি কম কষ্ট করেছে।

মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তির জ্বলন্ত প্রতীক ছিল বাবুরাম। গঙ্গার তীর আলো করে রাখতো।

আর নরেন ?

নরেনের কথা আর বলোনা। কত আর বলব তার কথা।

একবার কি খেয়াল হলো তার। আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম দুর্গাপূজা করলে। পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালো পুরুতকে আমার হাত করে।

অথচ পূজোর দিন হুট করে এসে বললে—"মা আমায় জ্বর দাও" —অমনি তেড়ে জ্বর এলো !

আমি ত ভেবেই বাঁচিনা। এখন কি হবে ? নরেন বলল, তুমি কিছুই ভেবো না মা ! আমি সেধে জ্বর নিয়েছি তার কারণ হলো সকল ছেলেরা যে কাজ করছে, তার মধ্যে কখন কোন ছেলেটা কি অন্যায় করে বসে আর আমি একটা থাপ্পড় মেরে দি, সেইজন্য। এ একরকম ভালোই হলো। রইলুম পড়ে। ওরাও প্রাণ খুলে কাজ করুক আর আমিও নিশ্চিন্ত।

তারপর কাজকর্ম শেষ হয়ে যেতে আমি বললাম, ও নরেন, কাজ সারা হলো এবার ওঠো বাবা।

অমনি ভালো মানুষের মত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো নরেন। যেন কিছুই হয়নি।

তাইতো নরেন আমেরিকা থেকে শিবনন্দকে চিঠি লিখলো "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হতে পারে না। আমাদের দেশে শক্তি অবমানিতা,

তাই দেশ আমার সকলের কাছে অধম বলে পরিচিত। এবার মা সারদা এসেছেন ভারতে সেই শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করবে। সেই জন্যেই আগে তাঁর মঠ চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস গিয়েছেন তাতে আমি ভয় পাই না।

আর একদিন একটি ছেলে এসে বললে, মা যদি অনুমতি করেন তাহলে দিনকতক বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

বুঝলাম মঠের উপর কোন কারণে ছেলের অভিমান হয়েছে।

প্রশ্ন করলাম,—কোথায় যাবে ?

সে বললো—কাশী যাবার ইচ্ছে আছে।

—টাকাকড়ি কিছু আছে সঙ্গে ?

—না, টাকাকড়ির কি দরকার। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাটতে হাটতে চলে যাবো।

মা হয়ে আমি কেমন করে বলি, তুমি যাও।

দারুণ গরমে চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে পিপাসা পেলে কে দেবে একটু জল, খিদে পেলে কে দেবে দুটো অন্ন।

তার আর যাওয়া হ'লো না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মা,—কার কাজ কে করছে!

ঠাকুর একদিন বলেছিল আমি আর দুবার আসব।

প্রথমবার একশো বছর পরে।

বাউলের বেশে এতখানি দাড়ি, মাথায় ঝুঁটি, গায়ে আলখাল্লা।

সারদা বললেন, আমাকে তামাক কাটা করে কাটলেও আর আসব না।

সেই কথা শুনে ঠাকুর বললেন, তোর সাধ্যি কি যে আসবি না। আসবি না তো যাবি কোথায় ?

সব তো কলমির ধাপ! একটা ডগা ধরে টান দিলেই সুড় সুড় করে সবাইকে আসতে হবে।

তারপর শ্রীমাকে বললেন, আমার হাতে থাকবে ভাঙ্গা পাথরের বাসন আর তোমার হাতে থাকবে হুকো কলকে। হয়তো বা ভাঙ্গা কড়ায় রান্না করে খেতে হবে। কোন ঠিক থাকবে না কিছুরই। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, যাচ্ছি তো যাচ্ছি।

তারপর গঙ্গার ওপারে বালী উত্তর পাড়ার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ঐ, ঐদিক থেকে আসবো আমরা।

একমাত্র নরেনই সাহস করে বলতে পেরেছে,—আমি লক্ষ জন্ম চাই।

একলক্ষবার জন্মগ্রহণ করবে সে এই ধরায়।

কেনই বা করবে না? তার আবার ভয় ভাবনা আছে নাকি?

সে যে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে।

ও যে জলন্ত জ্ঞান। ওদের তো পাপ হয়না। জ্ঞানীর আবার ভাবনা কিসের? বন্ধন বলে কোনো কিছুই তো নেই ওদের।

ভগবান চিরকাল ভক্তের কাছে হেরেছেন।

তবে ভক্ত হওয়া চাই। নইলে কেমন করে পাবে তাঁর করুণা।

তিনি আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁকে পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

পুকুরে তো কত মাছ আছে। তাকে পাবার জন্যে তোমাকে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হবে, তবেই তো তিনি সাড়া দেবেন।

রামেশ্বরম-এ দাঁড়িয়ে আবেশ ভরে দেখেছেন ভক্ত আর ভগবানের খেলা।

বিশাল সমুদ্রকে ভক্তরা বেঁধে ফেলেছিল ভগবানের আশির্বাদে চোখের নিমেষে।

ভক্তের প্রাণপণ চেষ্টা আর ভগবানের অঢেল আশির্বাদ।

লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরবার পথে সীতা তাঁর স্বামীর কীর্ত্তি

দেখে অবাক হয়ে ভাবলেন, কালের বুকে এই কীর্তি অক্ষর অমর করে রেখে যেতে হবে।

এখানে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে।

হনুমানকে আদেশ করলেন শিব নিয়ে আসতে।

পবন নন্দন হনুমান ছুটলো শিব আনতে। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে নানা জাতের শিব নিয়ে এলো।

কিন্তু আসল শিব অর্থাৎ কাশীর বিশ্বনাথ আসেন নি।

সীতা বললেন,—এ কি, তুমি আসল শিবকেই তো আনোনি। কাশী থেকে বিশ্বনাথকে নিয়ে এসো।

হনুমান আবার ছুটলো কাশী।

সেই যে গেল আর ফিরবার নাম নেই। সীতা অন্নপিণ্ড তৈরী করে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু হনুমানের পাত্তা নেই।

অতঃপর সীতা সেই অন্নপিণ্ড ঢেলে দিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পিণ্ড জমে গিয়ে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করলো।

সেই লিঙ্গরূপী শিবের নাম রাখলেন—রামেশ্বর।

এমন সময় হনুমান ফিরে এলো কাশীর বিশ্বনাথকে লেজে বেঁধে নিয়ে।

এসে দেখলো শিব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

তাই দেখে অভিমান হ'লো হনুমানের। একটু রাগও হ'লো। আর সেই রাগের বশবর্তী হয়ে সীতার সেই অন্নপিণ্ডের শিবকে লেজে জড়িয়ে ফেলল!

উদ্দেশ্য তাকে একটানে উপড়ে ফেলে দিয়ে তার আনা বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠা করবে।

তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে মারলে এক ঝটকা।

কিন্তু তাতে ফল হ'লো উল্টো।

শিব তো উঠলোই না বরং সেই ঝটকায় হনুমান ছিটকে গিয়ে

পড়লো বেশ খানিক দূরে। শিব যেমন তেমনি অচল অটল রইলেন।

একমাইল দূরে সেই জায়গাটার নাম হ'লো রামঝরকা।

শ্রীরামচন্দ্র তখন ভক্ত হনুমানকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন

—তোমার আনা শিবও প্রতিষ্ঠা হবে, বৎস।

হনুমান তখন গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে বসলো।

শ্রীরামচন্দ্র আবার বললেন,—আগে হনুমানের আনা শিবের পুজো হবে, তারপর হবে রামেশ্বরের।

ভক্তের মান বাড়ালেন ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র।

সব কথাই যেন মনে পড়ে যায় জগন্মাতা সারদামণির। অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

খোকা মহারাজ আর বাবুরাম মহারাজ।

পাশাপাশি দুজন বসে আহার করছে। এমন সময় একটা বিড়াল খোকার পাতের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিতেই খোকা মারলো একচড়।

—ও কি করলি? বাবুরাম আঁৎকে উঠলো। বললো, মা'র বাড়ীতে কে কোন বেশে থাকে বলা যায়?

মা দূর থেকে দেখছেন সব। কাছে এসে বললেন,—বেশ করেছ খোকা। বিড়ালটা ভারী দুস্টু হয়েছে আজকাল।

দেখ, ঠাকুর বলেছেন সামনা-সামনি মারা ভালো কিন্তু পিছনে কারুর নিন্দা কোরোনা। শুধু পিছনে কেন সামনা সামনিও কারো মনে দুঃখ দিও না।

অর্থাৎ রুক্ষ সত্যি কথা বললে যদি কেউ মনে দুঃখ পায়, তাহলে একটু ঘুরিয়ে বলো কথাটা।

যেমন একজন খোঁড়াকে "তুমি খোঁড়া হলে কেমন করে?" না বলে তোমার পা খানা অমন হ'লো কেমন করে—বলবে।

শ্রীমার জ্বর ছাড়ছে না। সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে মাকে কলকাতায় নিয়ে এলো।

চেহারা দেখে আঁৎকে উঠলো সকলে। শুধুমাত্র কঙ্কাল খানাই রয়েছে, আর কিছু নেই যে শরীরে।

কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি চিকিৎসা শুরু করেছেন। দিন কয়েক একটু ভালো মনে হ'লো, কিন্তু আবার মোড় ঘুরলো।

এবার ডাক পড়লো নীলরতন সরকারের।

সবাই বলছে কালাজ্বর ; ইনজেকসন্ দিতে হবে।

কিন্তু সবই বৃথা। কিছুতেই কিছু হয়না। সদাসর্বদা গা'টা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

এ্যালোপ্যাথিতে আর কুলোয় না। ডাক পড়লো হোমিওপ্যাথির!

এলেন জ্ঞান কাঞ্জিলাল। সেবিকাকে ধমকে দিলেন তিনি—তোমরা অতগুলো করে ভাত খাইয়ে অকালে মেরে ফেলতে চাও নাকি? না তোমাদের দ্বারায় সেবা করা চলবে না, আমি কালই নার্স পাঠিয়ে দেব।

সেই থেকে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

কারো হাতে খেতে চান না। একমাত্র শরৎ মহারাজ ফিডিং কাপে দুধ খাওয়ান। শরতের কোনো কথা ঠেলতে পারেন না মা। আর কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেন না।

খাট থেকে আমার বিছানা নামিয়ে মেঝেতে বিছানা করে দাও। আর এ ঘর থেকে ঠাকুরের ছবি পাশের ঘরে নিয়ে যাও। আমি তো আর চলতে পারি না। কলঘরেও যেতে পারি না। তাই এখন থেকে এ ঘরকে আর ঠাকুরের মন্দির বলা যাবে না।

করুণ দৃষ্টিতে তাকায় উপস্থিত ভক্তের দল।

—মাগো তুমি কবে সেরে উঠবে?

—কি জানি বাছা! ঠাকুর জানেন, একেবারেই ভালো হবো কিনা!

অনেকদিন পর রাধুকে ডাকলেন কাছে। বললেন, তুই জয়রামবাটী চলে যা।

ভক্তরা ভাবে যা বললেই কি আর রাধু যেতে পারে ?

সারারাত পালা করে ভক্তরা মায়ের সেবা করে একে অপরকে শোনায় তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

অন্য সকলে ভক্তিভাবে শোনে শ্রীমায়ের জীবনের অমৃত কথা।

সেবার পশ্চিম ভারত থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছেন মা'র কাছে।

মস্তবড় পণ্ডিত কাব্য শাস্ত্র কণ্ঠস্থ। কারো কাছে প্রণত হন না তিনি।

সকলেই তাঁর পদতলে মাথা নত করে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভগবৎ ভক্তিতে ভরপুর ; হাতে রয়েছে দণ্ড।

কিন্তু মা'র কাছে এসেই দণ্ড ফেলে দিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন দণ্ডধারী সন্ন্যাসী।

ত্যাগ করলেন তাঁর অভিমানের দণ্ড।

শ্রীমা তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নেন লজ্জায়। বললেন, আহা হা, আপনি আমাকে প্রণাম করবেন কেন ?

কার কথা কেন শোনে।

এমন শান্তি যে এখানে রয়েছে তা জানা ছিল না সন্ন্যাসীর। প্রণামে যে এমন তৃপ্তি জানতো না আগে।

সন্ন্যাসী বলেন,—আশির্বাদ দাও মা, ইহকালের এবং পরকালের।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন ভক্ত। মা বললেন—সন্ন্যাসীকে ফল দাও।

ভক্তটি এদিক ওদিক খুঁজে তিনটি আম নিয়ে এলেন।

তাই দিলেন সন্ন্যাসীর হাতে। তাই তিনবার কপালে ঠেকিয়ে ঝুলির মধ্যে রাখলেন সন্ন্যাসী। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ফল পেয়ে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। যেন স্বর্গের অমৃত পেয়েছেন চাইবা মাত্র।

ভক্তটিকে ডেকে মা জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি ফল ছিল না ?

না। বললেন ভক্ত।

খুঁজে দেখ, আরও আছে।

সত্যিই তাই। ভক্তটি গিয়ে দেখে আছে আর একটা আম।

শ্রীমা বললেন, দিয়ে এসো সন্ন্যাসীকে।

ভক্ত ছুটলেন আম নিয়ে।

সন্ন্যাসী তখন রাস্তায়। ভক্ত ছুটে এসে বললো, এই নিন মা আর একটা ফল আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আনন্দে সন্ন্যাসী রাস্তার উপর নাচতে শুরু করে দিলেন।

প্রথমে মা দিয়েছেন তিনটি ফল। ধর্ম, অর্থ আর কাম।

আবার এখন পাঠালেন শেষ ফলটি—মোক্ষ।

ধর্মার্থমোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে।

মনে মনে বুঝতে পারেন সন্ন্যাসী। দারুন অহঙ্কার ত্যাগ করে শ্রীমার চরণে পড়তে পেরেছিলেন বলেই না একসঙ্গে চারটি ফল লাভ করলেন।

যে মুহূর্তে পারবে অহঙ্কারমুক্ত হতে, পারবে নিজের যা কিছু সব বিলিয়ে দিতে সেই মুহূর্তে পাবে মোক্ষফল। তার এতটুকু বাকী থাকতে নয়। যথাযথ প্রণাম করতে পারলেই যথাযথ প্রসাদ পাবে।

এই হলো সারকথা

আপনি যখন থাকবেন না তখন আমরা কি নিয়ে থাকবো? প্রশ্ন করেন এক নারী ভক্ত।

কেন, জপ আর নাম নিয়ে থাকবে। বললেন শ্রীমা।

দিনরাত ঠাকুরকে ডাকো, ঠাকুরের নাম জপ করো। তাতেই মুক্তি পাবে। নির্ভর করো তাঁর উপর। তিনি রাখলে রাখবেন, ডোবালে ডোবাবেন এই চিন্তা করো। ঠিক তরে যাবে।

আর এক ভক্ত বললেন,—মা, মনটা বড় চঞ্চল, বসাতে পারছি না।

মা বললেন, ঝড়ও যে চঞ্চল বাবা। সে ঝড়ে আবার মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়!

তোমার মনের ঐ চঞ্চলতাই তো ক্লেদ গ্লানির মেঘ কাটিয়ে দিয়ে, বিষয় মেঘ উড়িয়ে দিয়ে হৃদয়াকাশকে করবে স্বচ্ছ সুনির্মল।

কিন্তু কাম যে যেতে চায় না। বললেন আর এক ভক্ত।

হেসে বললেন শ্রীমা—কাম কি একেবারে যায় গা? যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ কামও আছে। কাম না থাকলে ঈশ্বর কামনাও যে থাকে না। ভোগের থেকেই তো ত্যাগের জন্ম, কাম না থাকলে নিষ্কাম হবে কেমন করে।

কামকে যদি প্রেম করতে পেরেছ তাহলেই হলো তোমার নিষ্কাম সাধনা সার্থক। নইলে নয়।

বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে বসে আছেন মা। গাড়ী এলে যাবেন।

এমন সময় একটা কুলি কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে শ্রীমার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো। তারপর অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলো আর সেই কান্নার মধ্যে বলতে লাগলো—তুমিই আমার মা জানকী। আমি বহুদিন থেকে তোমাকে খুঁজছি।

কুলীটা মা জানকীকে স্বপ্ন দেখেছিল।

আজ স্বয়ং দেখলো শুভ্রবসনা সারদামণিকে। তার স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তাই ছাড়তে চায় না মায়ের চরণ।

মা বললেন, একটা ফুল নিয়ে আয় বাছা।

দৌড়ে গিয়ে একটা ফুল নিয়ে এলো কুলিটা। মা তক্ষুনি তাকে মন্ত্র দিলেন। মানব জন্ম সার্থক হয়ে গেল কুলি ভক্তের।

শ্রীমার পাশে বসে পঞ্জিকার পাতা উল্টে রাধু বললে,—এবার আশ্বিনে খুব মারামারি হবে। শ্রীমা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেন, কি?

পাশে বসেছিল এক ভক্ত; শুধরে দিয়ে বললো—মারামারি নয় মা মহামারী। রাধু পড়তে ভুল করেছে।

তা শুনে মা তো হেসেই অস্থির।

বললেন, লোকে বলে রাধুর উপর আমার নাকি ভীষণ মায়া। আমি নাকি রাধু রাধু করে পাগল। তা কি আর করি বলো। ঐ মায়াটুকুর জন্যেই যে মহামায়া বাঁধা পড়েছেন। আমি যে কেন সংসারের মাটিতে শিকড় আঁকড়ে পড়ে আছি তা কজন বোঝে।

এ সবই তাঁর দান।

তিনি তাঁর কাজটুকু শেষ করবার জন্যেই যে ঐ মায়া দিয়ে বেঁধে রেখে গেছেন। তাই তো বাঁধা পড়ে আছি।

নইলে মায়াশূন্য এ দেহটা ছাড়তে কতক্ষণ।

রাধুর উপর থেকে যেদিন মনটা তুলে নিতে পারবো সেই দিনই তো আমার শেষদিন।

রাধুর স্বামী মন্মথ মন্ত্র চায়।

মা বললেন, তোমাকে যে মেয়ে দিয়েছি মন্ত্র দিই কেমন করে? তাহলে যে কুলগুরু চটে যাবেন। আর তিনি চটলে যে আমারই মেয়ের অকল্যাণ হবে।

মন্মথ কিন্তু নাছোড়বান্দা।

কোন কথাই মানতে রাজী নয়। বলে, সেই যা তা কথা দিয়ে আপনি আমাকে ভোলাতে পারবেন, অত কাঁচা ছেলে আমি নই। শুধু মেয়ে নিয়ে ভুলে যাব তেমন মূর্খ নই আমি। মন্ত্র আমি নেবই।

অগত্যা মন্মথকে মন্ত্র দিতে হলো।

রাধুর কুষ্টিতে রয়েছে বৈধব্যযোগ। মনে মনে মা বললেন, ঠাকুরের নামে বিধির বিধানও কেটে যায়।

নরেন বলতো—অবতার কপালমোচন।

ঠাকুরই রাখবেন ওদের। ওরা যে ঠাকুরের দান। ঠাকুরের নামের উপরেই রয়েছে। আর থাকবেও।

মন্মথর খুড়ো ভোলানাথ চাটুজ্জ্যে সম্পর্কে মায়ের বেয়াই হন।

কিন্তু মাকে ডাকে মা বলে।

ভোলানাথের কাছে চিঠি লেখাবার সময় পাঠ লেখাচ্ছেন, বাবাজীবন! কাছে ছিল সুরোবালা। চিৎকার করে উঠলো। বললো—ওমা সেকি কথা! সে যে তোমার বেয়াই গো।

তার আমি কি করব। বলেন মা, সে যে মা বলে ডেকেই আনন্দ পায়; তৃপ্তি পায়। আমি কি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি? তাকে আমি বলে দিয়েছি— তার যা মন চায় তাই বলে সে আমাকে ডাকবে আমি তাতেই সাড়া দেব।

ছেলে আবার মাকে চিন্তা করে বেছে গুছে ডাকবে নাকি?

সুরোবালার আর কিছু বলার রইলো না।

মায়ের অবস্থা অবনতির দিকে চলেছে।

শ্রীমা আবার রাধুকে বলেন, তুই জয়রামবাটি চলে যা

রাধু অবাক হয়ে বললো—কেন?

—তা দিয়ে তোর দরকার কি, আমি বলছি চলে যা।

অবাক হয়ে সরলা বললো—রাধুকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারবেন?

—পারবো, পারবো। আমি মন তুলে নিয়েছি।

কথাগুলি বলবার সময় মনে হ'লো মা'র কণ্ঠ শুষ্ক স্পৃহাশূণ্য

খবর গেল শরৎ মহারাজের কাছে। যোগেন মা'ও ছুটে এলো। বলল,—এ তুমি কি বলছ মা? রাধুকে পাঠাবার কথা বলছ কেন?

মা বললেন,—এরপরে ওরা যে সেইখানেই থাকবে। আর চাইনে, আর নয়।

—তাহলে আমরা কেমন করে বাঁচবো, মা।

—কি করবো বলো। মূলশুদ্ধ মন উঠিয়ে নিয়েছি।

শরৎ মহারাজ বললেন,—মাকে আর রাখা গেল না। আর কোনো আশা নেই। রাধুই ছিল মা'র মায়া।

রাধুর বুকে বাজলো সেকথা বজ্রের মতো। পিসি তার আজ থেকে আর তার থাকবে না।

শরৎ মহারাজ বললেন,—দেখি শেষ চেষ্টা করে যদি রাধুর উপর আবার মন বসানো যায়। তাছাড়া তো আর কোনো উপায়ই নেই।

নিচেয় মা বিছানায় শুয়ে আছেন।

রাধু তার ছেলেকে চুপি চুপি ঘরের দরজা পার করে ছেড়ে দিল। আর নিজে দাঁড়িয়ে রইলো দরজার আড়ালে মা কি করেন দেখবার জন্যে।

সকলেই আশায় বুক বেঁধে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। কখন খবরটা আসে।

ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে মা'র বিছানার দিকে। রাধু নিঃশব্দে মনে মনে বলছে, যা বোকা ছেলে আরো এগিয়ে যা। গিয়ে সপাটে জড়িয়ে ধর তোর ঠাকুমাকে।

কিন্তু যা হবার নয় তা কি হয়?

এমন সময়ে মা চোখ মেলে চাইলেন। রাধুর ছেলে তখন একবারে কাছে এসে পড়েছে।

রুক্ষকণ্ঠে তার দিকে তাকিয়ে মা বললেন,—আর এগোসনে বলছি। মায়া কাটিয়ে ফেলেছি, আর পারবি না।

ছেলেটি সেইখানে স্তব্ধ হয়ে মায়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

ঘরের মধ্যে যে ভক্ত মেয়েটি ছিল তাকে ইশারা করে মা বললেন,—ওকে নিয়ে যা এখান থেকে।

ছেলেটি কেঁদে ফেলেছে ততক্ষণে রাধুও বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

অন্নপূর্ণার মা কাঁদতে কাঁদতে বললো,—তুমি না থাকলে আমাদের কি হবে মা?

—কিচ্ছু ভয় নেই অন্নপূর্ণার মা। জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে অন্যের দোষ দেখো না। শুধু নিজের দোষের কথা ভাবো আর শোধরাবার চেষ্টা করো। এ জগতে সকলেই তোমার আপন, কেউ পর নয়।

ক্রমে ক্রমে পাঁচটি গ্রহপূজা হলো, পাঁচ মহাবিদ্যার অর্চ্চনা হলো।

বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলায় শত চণ্ডীপাঠ হলো।

বারাসতের শ্মশানে স্বস্ত্যয়ন হলো।

কিন্তু মা'র অবস্থার কোনো উন্নতি হ'লো না।

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত দেড়টায় (৬ দণ্ড ৫৩ পল) শ্রীমা মহাসমাধিতে নিমগ্না হলেন।

তার আগে শেষবার শরৎ মহারাজাকে শেষ কথা বললেন,

—শরৎ, এরা সব রইলো, ওদের দেখো।

তারপরই মর্ত্ত্যধামের সকল মায়া পরিত্যাগ করে চোখ বন্ধ করলেন।

উপস্থিত ছিল যারা ; তারা মাতৃহারা শিশুর মত কেঁদে উঠলো।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'লো মহাসমাধির আগের মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মা'র দেহ কুঁচকে গিয়েছিল। আর একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আশ্চর্য হয়ে সকলে দেখলো, সেই দেহের ফুলো ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, ক্রমশঃ শরীরের কালোবর্ণ অদৃশ্য হয়ে—উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করছে। আর সেই মুখমণ্ডল থেকে যেন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

তিল তিল করে সময় কাটতে থাকে। সকলে অপেক্ষা করছে সকাল হবার।

সকাল হতে হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো সেই দারুণ দুঃসংবাদ !

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে লাগলো মা'র অগুনতি সন্তানের দল। একে একে এসে ভীড় করতে লাগলো।

সকলের চোখে জল। আজ থেকে সকলে হ'লো মাতৃহারা।

কিছুক্ষণ পরে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমা'র মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলো বেলুড়।

পূর্বনির্দ্দিষ্ট জায়গায় চিতাসাজানো হলো চন্দন কাঠে; নববস্ত্র পরানো হলো মাকে।

বেলা প্রায় দুটোর সময় জ্বলে উঠলো চিতা।

গঙ্গার ওপারে তখন মুসলধারে বৃষ্টি। কিন্তু এপারে যতক্ষণ চিতা জ্বলছে ততক্ষণ এক ফোটাও বৃষ্টি পড়েনি।

ঠিক শেষ মুহূর্ত্তে প্রবল বেগে বর্ষা এসে চিতার উপর শান্তিবারি বর্ষণ করে ধুয়ে দিল।

শ্রীশ্রীসারদামণির পূত দেহ পবিত্র গঙ্গার তীরে এমনি করে নিঃশেষ হয়ে গেল।

ঠাকুর বলতেন—ও আমার শক্তি, ও যে সে নয়।

নরেন বলতো—জ্যান্ত দুর্গা।

শিবলাল আর সেই ডাকাত ছেলে দেখেছিল মহাকালীরূপে।

আমরা অতশত বুঝি না। আমরা জানি তিনি আমাদের মা। পাতানো বা সৎমা নয়। জলজ্যান্ত আপন মা।

মাকে যে পায় সে আর কি চায়? এই বাস্তব জগতে আর কিছুই চাই না আমরা।

মাগো, মারলেও তুমি, ধরলেও তুমি! বিপদেও তুমি, সম্পদেও তুমি। তুমি ছাড়া এ জগৎসংসার সবই যে অন্ধকার।

তুমি সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী; সর্ব্বদোষ বিঘাতিনী। তাই তোমার চরণেই শরণ নিলাম। সব কিছু অর্পণ করলাম তোমার শ্রীচরণে।

—:০:—